শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ :

গুরুত্ব ও রূপরেখা

। মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ ।

মক্কার প্রথম মাদরাসা ও মক্কার ঘোষণা

শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের সূচনা

ইসলামের প্রথম অহী 'পড় তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। তাই ইলমের স্থান ইসলামে সর্বাগ্রে। ইলম ও ইসলাম দেহ-আত্মার মতই একাকার হয়ে আছে। সুতরাং ইসলাম যেমন সর্বজনীন, ইলমও তেমন সর্বজনীন। অহীর পাশাপাশি জাগতিক-মহাজাগতিক জ্ঞানও ইসলামী ইলমের অংশ। বরং জাগতিক-মহাজাগতিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার প্রতি ইসলাম যে প্রেরণা দিয়েছে অন্য কোনো ধর্ম কখনোই তা দেয়নি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা এক সাথেই শুরু করেছেন। তিনি দাওয়াতের মাধ্যমে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করতেন। যারা ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করত তাদেরকে ঈমান ও আমলের শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন। হযরত আরকাম ইবনু আবিল আরকাম আলমাখযূমী রা.-এর বাড়ি ছিলো তাদের মিলনস্থল ও মাদরাসা। (আখবারু মাক্কাহ ওয়ামা ফীহা মিনাল আছার: মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আযরাকী ২/২৬০, প্র. দারুল আন্দালুস, বৈরুত।) এখান থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌথশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। তাই ইতিহাসে মক্কার সর্বপ্রথম মাদরাসা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে 'দারুল আরকাম'।

দারুল আরকাম মাদরাসার মাধ্যমে শিক্ষার এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হয়। শুরু হয় ইসলামের সর্বজনীন শিক্ষা। মানুষের দৈহিক-আত্মিক সফলতা এবং পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতি-উন্নতির ইসলামী শিক্ষার যাত্রা এখান থেকেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো অহীভিত্তিক। অহী তথা কুরআন-সুন্নাহই ছিলো তাঁর শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। তাই তিনি অহীকে মূলভিত্তি করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। তবে তিনি তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেননি। বরং সেগুলোকে ইসলামীকরণ করেছেন। যতটুকু অহীসম্মত ও কল্যাণকর ততোটুকু গ্রহণ করেছেন এবং নতুন ইসলামী রূপ দিয়েছেন। আর যা আপত্তিকর তা নিষিদ্ধ করেছেন।

এভাবে ইসলামীকরণের মাধ্যমে জীবন ও শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে; জাহিলিয়্যাত ও দুনিয়ামুখী প্রবণতা হয়েছে ইসলামমুখী; শিক্ষা ও সভ্যতায় দু'মুখী নীতির সহাবস্থান বাতিল আখ্যায়িত হয়েছে। পরিসমাপ্তি ঘটেছে জ্ঞানের ধর্মীয় ও জাগতিক বিভাজন ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। অর্থাৎ خذ ما صفا ودع ما كدر [স্বচ্ছ ও উন্নত গ্রহণ করো, নোংরা ও পরিত্যাজ্য বর্জন করো।] এ নীতিটি ইসলাম বহির্ভূত যা কিছু আছে তা গ্রহণ-বর্জন করার অন্যতম মাপকাঠি। যেখানেই ইসলাম অহীবহির্ভূত কোনো বাস্তবতার সম্মুখিন হয়েছে, সেখানেই এ নীতির প্রয়োগ হয়েছে। এ নীতি আজও আছে, কিয়ামত অবধি থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

জাগতিক ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানকে ইসলামীকরণ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আদর্শ অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজারো মাদরাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আলোকেই এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হতো। হোক তা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অথবা জাগতিক ও মহাজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা। এখানে একজন আলেম আর একজন বিজ্ঞানীর মাঝে না বেশ-ভূষায় পার্থক্য হতো; না ইখলাছ ও লিল্লাহিয়্যাতের মাঝে। বিষয় ভিন্ন হলেও সবার ধর্ম এক, আদর্শও এক। এখানেই ইসলামের স্বকীয়তা ও সফলতার রায (রহস্য) নিহিত রয়েছে।

মুসলমানগণ প্রয়োজনে অন্যদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞানে অন্যদের শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছেন। তবে সবকিছু করেছেন ইসলামের স্বকীয়তা সমুন্নত রেখে এবং অন্যদের সভ্যতা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে। ইসলামের অমোঘ নীতি (স্বচ্ছ ও উন্নত গ্রহণ করো, নোংরা ও পরিত্যাজ্য বর্জন করো) অবলম্বন করে।

তারা অন্যদের দর্শন ও বিজ্ঞানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তবে গবেষণা করেছেন নিজেদের মত করে। এমনকি নিজেদের প্রচেষ্টা ও নিরলস গবেষণার মাধ্যমে অন্যদের সে পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। আবিষ্কার করেছেন নতুন পদ্ধতি ও নীতিমালা। ঢেলে সাজিয়েছেন সবকিছু নিজেদের মত করে, ইসলামের মত করে।

যেমন, গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান মুসলমানগণ গ্রহণ করেছেন। তবে নিজেরা গ্রীক জাতির কাছে বিলীন হয়ে যাননি। বরং তাদের দর্শন ও বিজ্ঞানকে ইসলামীকরণ করেছেন। নিজেদের প্রজ্ঞা ও প্রচেষ্টা দ্বারা দর্শন ও বিজ্ঞানকে এত বেশি সমৃদ্ধ করেছেন যে, মনে হবে এ দর্শন ও বিজ্ঞান ইসলামেরই আবিষ্কার।

খলীফা মামুন (২১৮হি./৮৩৩ঈ.) ৮৩০ খৃষ্টাব্দে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য বায়তুল হিকমাহ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর যুগে কুরআন- হাদীসের পাশাপাশি জাগতিক ও মহাজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এতই ব্যাপক ও সর্বজনীন ছিলো যে, তার যুগকে ঐতিহাসিকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আমীর আলী বলেন,

Mamun's reign was unquestionably the most brilliant and glorious of all in the history of islam...Mamun's caliphate constitues the most glorious epoch in saracenic history and has been justly called the `Augustan Age' of Islam.

The twenty years of his reign have left enquiring monuments of the intellectual development of the moslems in all directions of thought.

[মামুনের শাসনকাল প্রশ্নাতীতভাবে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাধিক উজ্জল ও মহিমান্বিত যুগ। ... মামুনের খিলাফাতকাল ছিলো আরব ইতিহাসে সবচে' গৌরবময় যুগ। তার সময়কালকে যৌক্তিকভাবে মুসলিম ইতিহাসে 'আগাস্টান যুগ' বলা হয়েছে (অর্থাৎ ইউরোপের ইতিহাসে আগাস্টাস (রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট) এর শাসনকাল যেমন ছিলো- অনুরূপ।)।

তার বিশ বছরের শাসনামলে চিন্তার সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন বিকাশের কীর্তিস্তম্ভ রেখে গিয়েছিলো।] (A short History of the Saracens: Ameer Ali, (London-১৯৬১), p-২৭৮.)

ঐতিহাসিকগণ মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, মুসলমানরা গ্রীকদের কাছ থেকে নিয়েছিল এক ফোঁটা; কিন্তু তাদের নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারে তা পরিণত হয়েছিল সমুদ্রে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা শিবলী নুমানী রাহ. সুন্দরই বলেছেন।

مسلمانوں نے جن علوم کی اشاعت کی ان میں سے کچھ ان کے ذاتی علوم ہیں جو خود انھوں نے ایجاد کئے، یا خاص طرح پر ان کو ترتیب دیا، کچھ ایسے ہیں جو دوسری قوموں سے حاصل کیے، اور پھر ایسی ترقی دی کہ گویا انھیں کے ایجادات سے ہیں۔

"মুসলিম জাতি যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করেছেন তন্মধ্যে কিছু তাদের নিজস্ব গবেষণা ও উদ্ভাবনকৃত। আর কিছু অমুসলিমদের থেকে গৃহীত। তবে তারা এতে এমন উৎকর্ষ সাধন করেছেন, যেন তা মুসলমানদেরই আবিস্কার।" (মাকালাতে শিবলী- মাওলানা শিবলী নুমানী পৃ. ৪, ২০-২১ প্র. দারুল মুসান্নিফীন শিবলী একাডেমী।)

তিনি আরও বলেন,

مسلمانوں نے ایک ذرہ پایا تھا اور اس کو آفتاب بنا دیا، ہیئت کو بہت کچھ ترقی دی، طبعیات کے متعلق ارسطو کی بہت سی غلطیاں دریافت کیں، منطق کو بالکل نئے طرز سے ترتیب دیا، اور چند اصول اضافہ کیے، نئے نئے آلات رصدیہ ایجاد کیے، نور کی رفتار دریافت کی، علم مناظر میں انعکاس کا قاعدہ معلوم کیا، جبر و مقابلہ جو چند جزئی

مسئلوں کا نام تھا انھیں کی طباعی سے ایک علم کے رتبہ پر پہنچ گیا، دواسازی، نسخوں کی ترییب، عرق کھینچنے کے آلے، موالید ثلاثہ کی تحلیل، تیزابوں کے فرق باہمی اور مشابہت کا امتحان، انھیں کی ایجادات سے ہیں، کیمسٹری کی انھیں نے بنیاد ڈالی، علم نباتات میں اپنے تجربوں سے دوہزار پودے اور اضافہ کردئے، غرض آج یونانی وعربی تصنیفات کا کوئی شخص اگر موازنہ کرے تو قطرہ ودریا کا فرق پائے گا۔

"مُسلمانرا پেয়েছেন এক কণা আর তা সমৃদ্ধ করে সূর্যে পরিণত করেছেন। উন্নত ও উৎকর্ষিত করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানকে। পদার্থ বিজ্ঞানে এরিস্টটলের অনেক ভুলের চিহ্নিত করেছেন। মান্তেক, যুক্তিশাস্ত্রকে নতুন করে রূপায়িত করেছেন। সংযোজন করেছেন আরও কিছু নীতিমালা। নতুন নতুন অনুবেক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার করেছেন। আলোর গতি আবিস্কার করেছেন। আবিস্কার করেছেন আলোকবিজ্ঞানে আলোর প্রতিফলনের নীতি ও শ্রেণীবিভাগ। এলজেবরা/বীজ গণিত যা সামান্য কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিলো মুসলমানদের গবেষণার ফলেই তা একটি শাস্ত্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে। তাছাড়া ঔষধ প্রস্তুত, পেসক্রিপশন ব্যবস্থাপনা বিন্যাসকরণ, পেশার পরিমাপযন্ত্র আবিস্কার করেছে। প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়বস্তুর চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন প্রকৃতির এসিডের পারস্পরিক পার্থক্য নির্ণয় এবং সাদৃশ্যতার নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ মুসলিমদের হাতেই হয়েছে। আর রসায়ন তো মুসলামনদেরই আবিস্কার। উদ্ভিদ শাস্ত্রের উপর নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণার আলোকে আরও দুই হাজার উদ্ভিদ সংযোজন করেছেন।

মোটকথা হলো, গ্রীক ও আরবীয় রচনাবলী নিয়ে কেউ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে বিন্দু ও মহাসমুদ্রের তফাৎ দেখতে হবে।] (প্রাগুক্ত)

সর্বোপরি, মুসলমানগণ দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা ইসলামীকরণে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুসলমানদের এ কৃতিত্বে সারা বিশ্ব প্রভাবিত হয়েছিলো। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানপিপাসুরা মুসলমানদের এ সকল প্রতিষ্ঠানে আসতে থাকে। এ সময় ইউরোপের অনেক ইহুদি-খ্রিস্টান মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে এবং সম্পূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের থেকে দর্শন ও বিজ্ঞান অর্জন করেছে। স্পেনসহ ইসলামী ভূখণ্ডের একাধিক প্রতিষ্ঠানের এমন গৌরবময় সাফল্য অর্জন রয়েছে। এ ধারার উত্তম নমুনা ছিলো, বর্তমান মরক্কোর জামিআতুল কারাবিয়্যীন।

মুসলিমদের প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয়দের জ্ঞানার্জন

জামিআতুল কারাবিয়্যীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২৪৫ হিজরী মোতাবেক ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। উচ্চতর জ্ঞানচর্চার জন্য ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ফিহরী কায়রাওয়ানী নামের এক মহিয়সী নারী এই প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করেছিলেন।(জামিউল কারাবিয়্যীন: ড. আবদুল হাদী তাযী ১/ ৪৬-৪৭ প্র. দারু নাশরিল মা'রিফা, মরক্কো।) অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠানটির সুখ্যাতি দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এ জামিআর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে মুসলমানরা কুরআন-হাদীসের ইলম শিক্ষার্জনের পাশাপাশি দর্শন ও বিজ্ঞান অর্জন করতে পারতেন। জাগতিক ও মহাজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হতো পূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থাপনায়। এ জামিআতেই ইবনে রুশদ ও ইবনুল আরাবীর মত অনেক দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ফকীহ, কাযী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির শিক্ষা লাভ করেছেন।

শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী হওয়াতে এখানে নিয়্যাত, ইখলাছ, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধে ইবনে রুশদের মত দার্শনিক আর ইবনুল আরাবীর মত মুহাদ্দিসের মাঝে পার্থক্য ছিলো না।

জ্ঞান চর্চায় এটি ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। জামিআ কারাবিয়্যীনে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছে তখন পুরো ইউরোপজুড়ে কোনো জামিআ বা ইউনিভার্সিটি ছিলো না। সুতরাং জামিআ বা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলমানরাই প্রাগ্রসর। স্বয়ং ইউরোপীয়রাই এর স্বীকৃতি দিয়েছে। জামিআতুল কারাবিয়্যীনের ইতিহাসবিদ ড. আবদুল হাদী আততাযী বলেন,

إذا عرفنا أن جامعة بولونية بإيطالية أسست سنة ١١٥٨، وجامعة السوربون عام ١٢٠٠، وأعقبتها أوكسفورد وسلامنكا، قدرنا إذن ما تضافرت عليه نقول بعض الأساتذة والمستشرقين والمؤرخين الأجانب ممن كتبوا في شأن فاس.

فقد كتب الأستاذ ديلفان منذ زهاء قرن، يقول : لقد كانت مدينة فاس بحق دار العلم بالمغرب، وتعد جامعة القرويين فيها أول مدرسة في الدنيا.

وكتب المستشرق الروسي جوزي منذ ثلاثة أرباع القرن يقول : إن أقدم كلية في العالم ليست في أوربا كما كان يظن، بل في إفريقيا في مدينة فاس عاصمة المغرب...

وقال ...الاخوان جان وجيروم طارو..: في هذه القرويين حيث كانت تزدهر علوم الميقات وفن الجبر، في وقت لم يعتن أحد فيه بهذيه الفنين....

وقال الأستاذ روم لاندو : وقد شيد في فاس منذ أيامها الأولى جامع القرويين الذي هو أهم جامعة وأقدمها، وفي القرويين هنا كان العلماء منذ حوالي ألف سنة يعكفون على المباحث الدينية والمناظرات الفلسفية التي قد تتجاوز دقتها إدراك فكرنا الغربي، وكان المثقفون يدرسون التاريخ والعلوم والطب والرياضيات، ويشرحون أرسطو وغيره من مفكري الإغريق..

"যদি আমরা জানি, ইটালির বুলোনা (BLOGNA) ইউনিভার্সিটি ১১৫৮ খ্রি. সোরবোন (প্যারিস) ১২০০ অব্দে এবং অক্সফোর্ড ও সালামাঙ্কা স্পেন) ইউনিভার্সিটি তারও পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো, মরক্কোর 'ফাস' (FEZ) এর ব্যাপারে প্রাচ্যবিদ ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের অনেকে যা উল্লেখ করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রফেসর ডেলকান এক যুগ আগেই লিখেছেন, 'ফাস' শহর বাস্তবেই মরক্কোর অনন্য জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। সেখানকার কারাবিয়্যীন ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত ভার্সিটি।

রুশ প্রাচ্যবিদ জোসি অর্ধযুগ পূর্বেই লিখেছেন, বিশ্বের প্রাচীনতম কলেজ ইউরোপে নয় যেমনটি ধারণা করা হতো। বরং আফ্রিকায়; মরক্কোর রাজধানী শহর 'ফাস'-এ। জন ও জেরম বলেন, এ কারাবিয়্যীনে ঐ সময় ইলমুল মীকাত ও বীজগণিত উৎকর্ষলাভ করছিলো, যখন পৃথিবীতে অন্য কোথাও এ দু' শাস্ত্রে কাজ হচ্ছিলো না।

প্রফেসর 'রম ল্যান্ড' (ROM LANDAU) বলেন, ফাস শহরের আদিকালেই সেখানে জামিউল কারাবিয়্যীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। কারাবিয়্যীন এ দু হাজার বছর ধরে স্কলারগণ ধর্ম ও দর্শন নিয়ে এমন আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করে আসছেন, যার সুক্ষতা হয়তো পাশ্চাত্য বুদ্ধিবৃত্তিকে ছাড়িয়ে যাবে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গণিত চর্চা করা হতো। এরিস্টটল ও গ্রীকের অন্যান্য দার্শনিকদের দর্শন পাঠ ও বিশ্লেষণ করা হতো।" (জামিউল কারাবিয়্যীন ১/১১৪)

হাজার হাজার ইউরোপের ছাত্র এ জামিআমুখী হয়। উদ্দেশ্য, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করা। তারা মুসলমানদের কাছে ইসলামী ভাবধারাতেই শিক্ষালাভ করত। এ জামিআর অনেক বিধর্মী ছাত্র পরবর্তীতে স্ব-ধর্ম ও জাতির মাঝে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এমনকি এ জামিআর একজন ছাত্র খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা 'পোপ' নিযুক্ত হয়েছিল। এটা আমাদের নিছক দাবি নয়। বরং ইউরোপীয়রাই তা স্বীকার করেছে। ড. আবদুল হাদী তার উপরোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

قال الأستاذ جوزي كريستوفيتش : إن أقدم مدرسة كلية في العالم أنشئت لا في أروبا كما كان يظن، بل في إفريقية، في مدينة فاس عاصمة بلاد المغرب سابقا، إذ قد تحقق بالشواهد التارخية أن هذه المدرسة كانت تدعي كلية القرويين، قد أسست في الجيل التاسع للميلاد، وعليه فهي ليست فقط أقدم كليات العالم، بل هي الكلية الوحيدة التي كانت تتلقى فيها الطلبة العلوم السامية في تلك الأزمنة، حينما لم يكن سكان باريز واكسفورد وبارو وبولونيا يعرفون من الكليات إلا الاسم، فكانت الطلبة تتوارد على كلية القيروان من أنحاء أروبا وإنكلترا فضلا عن بلاد العرب الواسعة للانخراط في سلك طلابها، وتلقى العلوم السامية باللغة العربية مع الطلبة الطرابلسيين والتونسيين والمصريين والأندلسيين وغيرهم، ومن جملة من تلقى علومه في هذه الكلية من الأوربيين جيربرت أو البابا سيلفيستر، وهو أول من أدخل إلى إوربا الأعداد العربية وطريقة الأعداد المألوفة عندنا بعد أن أتقنها جيدا في الكلية المذكورة...

"অধ্যাপক জোসি ক্রিস্টোভিচ বলেন, দুনিয়ার প্রথম কলেজ ইউরোপে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, যেমনটি ধারণা করা হতো। বরং আফ্রিকাস্থ মরক্কোর প্রাচীন রাজধানী ফাস এ প্রথম কলেজ খোলা হয়।

ইতিহাস সাক্ষী, কারাবিয়্যীন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নবম খ্রিস্টাব্দে। এ হিসেবে এটি শুধু বিশ্বের প্রাচীনতম কলেজই নয়; বরং সে যুগে এটিই একমাত্র কলেজ ছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতো। তখন প্যারিস অক্সফোর্ড , পেরু ও বুলোনার অধিবাসীরা কলেজ-ভার্সিটির নাম ছাড়া আর কিছু জানত না। আরববিশ্ব ছাড়াও ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের আনাচ-কানাচ থেকে শিক্ষার্থীরা এই কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ছুটে আসত। এখানেই তারা ত্রিপলি, তিউনিস, মিশর ও ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষার্থীদের সাথে উচ্চশিক্ষা লাভ করত। এ কলেজের ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে জার্বার্ট (এউজইউজঞ) তথা পোপ সিভেস্টার উল্লেখযোগ্য। ইনিই সর্বপ্রথম ইউরোপে আরবী সংখ্যা এবং প্রচলিত সংখ্যাপদ্ধতি নিয়ে আসেন। যা তিনি উক্ত কলেজে ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছিলেন।" (জামিউল কারাবিয়্যীন ১/১১৫।)

বিস্তারিত জানার জন্য ড. আব্দুল হাদী আততাযী-র'জামেউল কারাবিয়্যীন' নামের তিন খণ্ডের কিতাবটি দেখা যেতে পারে।(আফসোসের বিষয় হলো, ইফা থেকে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষে এ জামিআর নাম উল্লেখ থাকলেও জামিআ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।)

ইউরোপের প্রতি মুসলমানদের এ অবদান অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কেউ কেউ অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখালেও অনেকেই অকপটে তা স্বীকার করেছেন।

আধুনিক যুগের ইসলামী দার্শনিক ও কবি মুহাম্মাদ ইকবাল (১৯৮৩ঈ.) স্বীয় গ্রন্থ 'রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম' এ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইসলামিক গোড়াপত্তনের কথা বিলম্বে হলেও ইউরোপ অবশেষে স্বীকার করেছে। ব্রিফল্টের 'মেকিং অব হিউম্যানিটি' নামীয় পুস্তক থেকে আমি এখানে দু'একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি,

মুসলিম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের অক্সফোর্ডস্থ উত্তরাধিকারিগণের নিকটেই রজার বেকন আরবী এবং আরবীয় বিজ্ঞান শিখেছিলেন। তিনি অথবা তাঁর সম-নামীয় বৈজ্ঞানিক কেউই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী নন। রজার বেকন ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান ও পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী নন। রজার বেকন ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান ও পদ্ধতির একজন প্রচারক ছাড়া অধিক কিছু ছিলেন না। তিনি এ কথা প্রচার করতে কখনও দ্বিধাবোধ করেননি যে, তাঁর সমসাময়িকদের পক্ষে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে আরবী, এবং আরবীয় বিজ্ঞান শিক্ষা পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তক কে ছিলেন, এ নিয়ে বিতর্ক ইউরোপীয় সভ্যতার আদি সম্বন্ধে যে বিরাট ভুল করা হয়, তারই একটা অংশ মাত্র। বেকনের সময়ে আরবদের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি সমগ্র ইউরোপে প্রচার লাভ করেছিল এবং আগ্রহের সাথে অনুশীলিত হতো।

বিজ্ঞান হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীতে আরব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, কিন্তু এর ফল পরিপক্ক হয়েছিল বিলম্বে। মূর-সংস্কৃতি অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে যাবার অনেক দিন পর তার গর্ভজাত এই বিজ্ঞান সন্তানটি পূর্ণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানই ইউরোপের প্রাণসঞ্চার করেনি। ইসলামী সভ্যতার অন্যান্য এবং বহুমুখী প্রভাব আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের প্রথম উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল।'

'যদিও ইউরোপীয় প্রগতির এমন একটা ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের তামাদ্দুনিক প্রভাবের সুনিশ্চিত নিদর্শন না মিলে, তবু প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের জাগরণের মতো আর কোন কিছুতেই এই প্রভাব এত সুস্পষ্ট আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর এই প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবই আধুনিক জগতের স্থায়ী ও বিশিষ্ট শক্তি এবং তার জয়ের মূল উৎস।'

'আরবীয় বিজ্ঞানের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান শুধু যুগান্তকারী মতবাদের আবিষ্কারের জন্যে ঋণী নয়; আরবীয় তমদ্দুনের নিকট আধুনিক বিজ্ঞান এর চেয়েও বেশি ঋণী : বিজ্ঞানের জন্মই হয়েছে আরব-সংস্কৃতির বুকে। আমরা দেখেছি, প্রাচীন জগত ছিল প্রাক-বৈজ্ঞানিক। গ্রীকদের জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত ছিল বিদেশ থেকে আমদানী করা বস্তু এবং এগুলোর সাথে কখনই গ্রীক সংস্কৃতির পুরোপুরি সামঞ্জস্য হয়নি। বিধিবদ্ধকরণ (systematization) সামান্যকরণ (Generalization) এবং তত্ত্বীকরণ (Theorization) গ্রীকরা করেছিল, কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে গবেষণা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আহরণ, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পুংখানুপুংখ ও দীর্ঘায়িত অনুসন্ধান- এসব ছিল গ্রীক প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান-চর্চা এক-আধটু হয়েছিল গ্রীক আমলের

আলেকজান্দ্রিয়ায়। যাকে আমরা বিজ্ঞান বলি, ইউরোপে তার বিকাশ হয় একটা নতুন অনুসন্ধিৎসার ফলে; গবেষণার নতুন পদ্ধতি, পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাণের পদ্ধতি এবং গণিতের বিকাশের ফলে। এ-সবই ছিল গ্রীকদের অজ্ঞাত। ইউরোপে এ-সবের প্রেরণা এনে দিয়েছিল আর এসব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল আরবরাই।'(ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন: ড. মুহাম্মদ ইকবাল, পৃ. ১৭১-১৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।)

রবার্ট ব্রিফল্ট যথার্থই বলেছেন,

'ইউরোপের উন্নতি-অগ্রগতির এমন কোনো অঙ্গন নেই যেখানে ইসলামী সভ্যতার বিরাট অবদান নেই। বস্তুত ইউরোপীয় জীবনের উপর ইসলামের বিপুল প্রভাবক ভূমিকা রয়েছে।'(মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?: সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী পৃ. ২৩৪ প্র. দারুল কলম আশরাফাবাদ, ঢাকা)

মুসলিম উম্মাহর পতন ও ইউরোপীয়দের উত্থান

ইসলামী খেলাফতের পতন আর মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের ফলে জ্ঞানের ময়দানের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ইউরোপীয়দের হাতে। তারা পূর্ণ উদ্যম ও স্পৃহা নিয়ে বিজ্ঞান চর্চায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানকে সার্বিকভাবে গবেষণা ও গ্রন্থনা দ্বারা সুসমৃদ্ধ করে তোলে। তারা নতুনত্ব ও সৃজনশীলতায় এত অগ্রগামী হয় যে, মুসলমানদের অবদান ছাপিয়ে যায়। তারাই বিজ্ঞানে সর্বেসর্বার রূপ ধারণ করে।

তারা দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠে। পৃথিবী ও জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে থাকে। জন্ম দেয় অভিনব বিভিন্ন মতবাদের। এর মাঝে সবচেয়ে ভয়ংকর মতবাদ হলো চারটি- কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম, সেক্যুলারিজম ও ফ্যাসিজম। ইউরোপিয়রা দু'মুখী শিক্ষাব্যবস্থায় যেহেতু বিশ্বাসী নয় তাই যখন তারা কোনো একটি মতবাদ গ্রহণ করেছে তখন নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সেভাবে সাজিয়েছে। শিক্ষাকে মাধ্যম ধরেই নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়েছে এবং সফলও হয়েছে।

এভাবে ইউরোপীয়দের উত্থানের ফলে নতুন নতুন শিক্ষাবিজ্ঞান জন্ম নেয়। ক্রমান্বয়ে মুসলিমরা তাদের দ্বারস্থ হয়ে পড়ে। অনেকটা বাধ্য হয়েই নিজেদের প্রতিষ্ঠানে তাদের শিক্ষাবিজ্ঞান গ্রহণ করতে হয়।

ইউরোপীয়দের শিক্ষাবিজ্ঞান : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতি জানার জন্য ইউরোপীয়দের উত্থানের কারণ ও প্রেক্ষাপট জানা-ই যথেষ্ট। ইউরোপীয়দের উত্থান হয়েছিলো, বিশ্বাস আর ধর্মের বলয় থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে। তারা খ্রিস্টধর্মের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে বস্তুবাদের ফ্রেমে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাদের ফিতরাহ ও বিশ্বাস চলে যায় বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে। তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় লাগামবদ্ধ উটের মত, বিজ্ঞান যেখানে চায় নিয়ে যেতে পারে।

তারা ধর্মকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলো; কিন্তু সক্ষম হয়নি। কীভাবেই বা হবে? মানবকে বাঁচিয়ে রেখে তার প্রকৃতিকে নির্মূল করা যায় না। ধর্ম মানব প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অবশেষে তারা ধর্মকে সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী থেকে আলাদা করে। ধর্মকে বানিয়ে দেয় 'পার্সোনাল ম্যাটার' বা ব্যক্তিগত বিষয়। নিছক ব্যক্তিগত প্রশান্তির জন্য কেউ চাইলে ধর্ম মানতে পারে। এর বাইরে ধর্মের কোনো প্রভাব নেই।

তারা নিজেদের এ নীতি ও মতাদর্শের আলোকে জীবন, পরিবার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়ন করে এবং নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা সাজিয়ে নেয়।

ইউরোপ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, শিক্ষাব্যবস্থা আমদানী-রপ্তানীর বিষয় নয়। বরং প্রত্যেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হবে সে দেশের প্রকৃতি, সমাজ, চাহিদা ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে। তারা এক মতাদর্শের ধারক বাহক হয়ে অন্য মতাদার্শের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

সোভিয়েত রাশিয়া বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশে স্বাধীনতার বড় প্রবক্তা। তাই কোনো ধর্ম বা কোনো মতাদর্শের বাধ্যবাধকতা সেখানে না থাকা ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু রাশিয়ার শিক্ষানীতি পুরোটাই কমিউনিজম নীতির উপর নির্মিত। শিক্ষাব্যবস্থায় তারা এমন কোনো নীতি

অনুমোদন করে না, যা পুঁজিবাদীদের হাতে তৈরী হয়েছে। কারণ এমন শিক্ষাব্যবস্থা তাদের কমিউনিজম ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাবিদ গ. ঈ. এড়াবৎহ বলেন,

إن العلم الروسي ليس قسما من أقسام العلم العالمي، وإنه قسم منفصل قائم بذاته، يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف، فإن سمة العلم السوفيتي الأساسية أنه قائم على فلسفة واضحة متميزة، إن التحقيقات العلمية لا تزال في حاجة إلى أساس وأن أساس علومنا الطبيعية الفلسفة المادية التي قدمها ماركس وأنجلس ولينين وستالين، وإنا نريد أن نخوض – وفي أيدينا هذه الفلسفة – في معترك العلم الطبيعي ونصارع جميع التصورات الأجنبية التي تناهض فلسفتنا المادية والماركسية بكل حزم وقوة.

"রুশ শিক্ষাদর্শন আন্তর্জাতিক শিক্ষাদর্শনের অংশ নয়। বরং এ শিক্ষাদর্শন নিজস্ব স্বকীয়তায় অন্য সমূহ দর্শন থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও অনন্য। কারণ, সোভিয়েত শিক্ষাদর্শনের একটি মৌলিক চরিত্র হলো, এটি একটি স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত তথা, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণসমূহ অবশ্যই কোনো একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর আমাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হলো সেই বস্তুবাদী দর্শন, যা মার্কস, অ্যাঞ্জেলস, লেনিন ও স্টালিন পেশ করেছিলেন।

আমরা এ দর্শনকে নিয়েই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই; পূর্ণ শৌর্যবীর্যে আমাদের বস্তুবাদী ও মার্কসীয় দর্শনের সাংঘর্ষিক অন্যসব ধ্যান-ধারণার মোকাবেলা করতে চাই।" (নাহওয়াত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা- সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী পৃ. ৬৪-৬৫)

এমনিভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলো নিজেদেরকে মুক্তচিন্তার প্রবক্তা বললেও তারা নিজেদের নীতিবিরোধী কোনো শিক্ষানীতি অনুমোদন করে না। পুরো ইউরোপ আমেরিকার অবস্থা একই রকম। আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদাবী রাহ. (১৪২০হি.) বলেন,

"এমনিভাবে পুঁজিবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলো যদিও ধর্মের ব্যাপারে মুক্ত চিন্তাধারা প্রচার করে এবং মুক্তভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণকে জরুরি মনে করে, তবু তারা স্বদেশে বাইরের চিন্তাধারা ও মতবাদ তথা এমন কোন শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় যার দ্বারা তাদের দেশে সমাজতন্ত্র এবং চরমপন্থী কমিউনিজমের বীজ রোপিত হয়। কোন কমিউনিস্ট দেশের বিখ্যাত শিক্ষাবিদকেও তারা নিজ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের সুযোগ দেয়ার চিন্তা করে না।

শুধু এতটুকুই নয়; বরং পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদগণ বাইরের দেশ থেকে শিক্ষাব্যবস্থা আমদানির ঘোর বিরোধী। যদিও তারা চিন্তা ও মতাদর্শের দিক থেকে যত কাছের হোক না কেন!

উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ড ফ্রান্সের শিক্ষানীতি আমদানী করতে আগ্রহী নয়; ফ্রান্সও ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার ধার ধারে না। অথচ উভয় রাষ্ট্র একে অপরের গভীর মিত্র। সুতরাং চিরশত্রু জার্মানীর শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করার তো প্রশ্নই উঠে না।

ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক মৈত্রী, প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ- এতসব ঐক্যের দিক থাকা সত্ত্বেও মার্কিন শিক্ষাবিদগণ ব্রিটেন থেকে শিক্ষাব্যবস্থা ধার নেন না। অনুরূপ ব্রিটিশরাও মার্কিন শিক্ষানীতির কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না। তাদের দৃষ্টিতে শিক্ষানীতি এমন বস্তু নয়, যা শিল্পপণ্য ও কাঁচামালের ন্যায় বহির্বিশ্ব থেকে আমদানী করা যায়।

প্রখ্যাত মার্কিন শিক্ষাবিদ Dr. J. B. conant তার Educacion & Liberty গ্রন্থে লিখেছেন, "শিক্ষানীতি না লেনদেনযোগ্য বস্তু; না অন্য দেশ থেকে সরবরাহ করা হয় এমন কোনো পণ্য। আমরা অতীতে ইউরোপ বা ব্রিটিশ শিক্ষানীতির যেসব বিষয় গ্রহণ করেছি, তাতে লাভের তুলনায় ক্ষতি বেশি হয়েছে।" (নেযামে তালীম-সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী পৃ.৫৪-৫৫ প্র. সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ একাডেমী।)

এরকম আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যাবে। তবে এখানে আশা করি এতটুকুই যথেষ্ট।

ইউরোপীয় ইতিহাসের আলোকে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে সহজেই দুটি দিক ফুটে উঠে-

এক. শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাসের মাঝে জনগণের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন

তারা জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে যে চিন্তা পোষণ করে সিলেবাসে তাই পড়ে। উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে যা বিশ্বাস করে ক্লাসে তাই খোঁজে পায়। তাদের পরিবার ও স্কুল চিন্তা- চেতনার দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তারা কখনোই দুমুখো নীতি বা সংঘাতপূর্ণ শিক্ষাব্যস্থা অনুমোদন করে না। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছে যে, দুমুখো শিক্ষাব্যবস্থা সৃজনশীল জ্ঞানী তৈরী করবে না। বরং কিছু বিকলাঙ্গ মেধা তৈরী করবে। তাই তারা নিজেরা নিরাপদে থেকে এই অভিশাপ মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করছে।

দুই. ভিন্ন চিন্তা ও আদর্শে গ— উঠা শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন

নিজেদের আদর্শ বহির্ভূত বা বিরোধ কোনো শিক্ষাব্যবস্থাকেই তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখতে হলে এ দু দিক গ্রহণ করার বিকল্প নেই। তাই তারা মনে-প্রাণে তা গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উভয়টিই অনুপস্থিত। মুসলমান হয়েও সেক্যুলার শিক্ষাব্যস্থায় লেখাপড়া করতে হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরোপীয়দের আইডোলোজিক্যাল এটাক্ট

সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ইউরোপীয়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারা নিজেদের আদর্শ-সভ্যতার প্রচার-প্রসার ও আধিপত্য বিস্তার করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিমসহ অন্যদের উপর তারা আইডোলোজিক্যাল এটাক্ট করছে। তারা নিজেরাই বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করেছে।

প্রথমে তারা মুসলিম দেশ থেকে মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার নামে ইউরোপে নিয়ে যায়। কিন্তু এ কার্যক্রম প্রচুর ব্যয়বহুল ও অন্যান্য কারণে ব্যাপক সফলতার মুখ দেখেনি। তাই খ্রিস্টান মিশনারীরা একটি বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্কেইম প্রস্তুত করে।

সর্বপ্রথম এ প্রস্তাব রাখেন (Danial Bilss I Wiliam Tomson)। এরাই ১৮৬১-১৮৬৩ তে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার ধারা নিয়ে গবেষণা করে। উদ্দেশ্য ছিলো, একদিকে মুসলিমদের থেকে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারক গড়ে তোলা অপরদিকে বিরাট একটি জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করা। ফলে এ পরিকল্পনা অনুসারে তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, লেবানন এবং ইরাকে এ ধরণের স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণ জনগণও এসব প্রতিষ্ঠানমুখী হয়ে পড়ে। খ্রিস্টান মিশনারীদের সুদূর দৃষ্টি ছিলো, উচ্চ পরিবার ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের দিকে। কারণ, রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রকরা এসব পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার লক্ষ্যে নিম্নে তাদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা হলো,

আমেরিকান বংশোদ্ভুত প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান মিশনারী Samuel Zweimir (১৮৬৭-১৯৫৩) ১৯২৪ঈ.তে অনুষ্ঠিত খ্রিস্টান মিশনারীদের কনফারেন্সে উত্থাপিত একটি রিপোর্টে বলেন,

'আমাদের সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রতিটি পদক্ষেপেই মুসলিম নবপ্রজন্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা এ প্রজন্মের প্রতি নিবদ্ধ রাখা। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে এ মিশনটিকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়া। কারণ, নবপ্রজন্মের মাঝে ইসলামী ভাবধারা শৈশব থেকেই তৈরী হতে থাকে। তাই মুসলিম শিশুদের চেতনা-অনুভূতি পরিপক্ক হওয়ার আগেই তাদের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যয় করতে হবে।

মি. Takle বলেন,

'আমরা স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতি তো মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করবই, সাথে সাথে পশ্চিমা শিক্ষার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করব। অনেক মুসলমান এমন আছে যারা কেবল ইংরেজী শিখেই ঈমান ও ধর্ম বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কারণ, আমাদের শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবই পড়ে কোনো ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা সহজ থাকে না।

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ Louis Massignon (১৮৮৩-১৯৬২) বলেন,

'প্রাচ্যের যেসব শিক্ষার্থীরা ফ্রান্সে আসে তাদেরকে খ্রিস্টীয় রঙ্গে রঙ্গীন করতে হবে।

Anna Milligan একজন খ্রিস্টান মিশনারী নারী। তিনি বলেন,

'ইসলামে কোনো রাস্তা নেই। শিক্ষাব্যবস্থাই নবপ্রজন্মকে খ্রিস্ট ধর্মের নিকটে নিয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে চিন্তা-চেতনায় যে প্রভাব পড়বে তা মুছে যাবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের সম্ভাব্য নীতিনির্ধারকরাও এ প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না।'

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এইচ. এ. আর. গীব (H. A. R. Gibb) এ শিক্ষার পরিণতি ও সফলতা সম্পর্কে বলেন,

'এ সব স্কুলগুলো শিক্ষার্থীদের চরিত্রকে একটি বিশেষ রঙ্গে রঙ্গীন করেছে। তাদের ঝোঁক-প্রবণতা এবং মন-মানসিকতাকে একটি বিশেষ ধাঁচে ঢেলে সাজিয়েছে।

সবচে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা হলো, এ সব স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে ইউরোপীয় ভাষা শিখিয়েছে। এগুলোই সরাসরি তাদেরকে ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা ও জীবনব্যবস্থাকে আপন করে নিতে বাধ্য করবে।'

তিনি আরও বলেন,

"মিডিয়া ও আধুনিক স্কুলগুলোর মাধ্যমে প্রচারিত আমাদের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে, ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।"(দ্র. নিযামে তালীম ওয়া তারবিয়াত মাওলানা ওয়াযিহ রশীদ নাদাবী রাহ. পৃ. ৩৬-৩৯। আরও জানতে দেখুন, আল্ গারাতু আলাল আলমিল ইসলামি': A lechatelier , আলফাতিকান ওয়াল ইসলাম: ড. যায়নাব আবদুল আযীয, হুছুনুনা মুহাদ্দাদাতুন মিন দাখিলিহা: ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ হুসাইন, আততাবশীর ওয়াল ইস্তে'মার ফিল বিলাদিল আরাবিয়্যাহ: ড. মুস্তফা খালেদী)

তিনি অন্যত্রে বলেন,

"পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা হলো প্রাচ্যের সভ্যতাকে পাশ্চাত্যে রুপান্তরিত করার অন্যতম একটি কার্যকরী মাধ্যম। এভাবে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটালে তা বর্তমান সভ্যতাকে পশ্চিমাকরণে ব্যাপক ও গভীর করতে ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য কার্যকরী দিক যা মুসলিম জাতিগুলোকে পূর্বোক্ত লক্ষ্যের দিকে একযোগে ঠেলে দিবে। (মিনাত তাবাঈয়্যাতি ইলাল আছালা ফী মাজালিত তালীম: আনওয়ার জুনদী, পৃ. ৮১ প্রকাশনা: দারুল ইতিসাম, দ্র.আততরিক ইলাল আছালা: আনওয়ার জুনদী প্র. দারুছ ছাহওয়া, কায়রো।)

ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনীর পাঠ্যবই 'দ্য প্রটোকল' এ এমন অনেক চাঞ্চল্যকর বক্তব্য রয়েছে। এতে উল্লেখ হয়েছে, "তোমরা আরবদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাও, তাহলে তারা এসবের পেছনে পড়বে। তখন তারা না থাকবে মুসলমান, না হবে বিজ্ঞানী।" (দ্য প্রটোকল, সূত্র, নয়া দিগন্ত, ২৫ জানুয়ারি ২০১৯।)

ভারত উপমহাদেশে মুসলমানরা আরও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় বৃটিশদের দ্বারা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ব্রিটিশরা ভারতের ভূখণ্ড দখল করে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ বিশেষ করে মুসলিমদের সাথে সংঘাত থাকায় তারা স্বাভাবিকভাবে নিজেদের কার্য পরিচালনায় বাধাগ্রস্ত হয়। তাই তারা শুরু করে আইডোলোজিক্যাল এটাক্ট। শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে তারা ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। উদ্দেশ্য, ভারতে তাদের একনিষ্ঠ কিছু কর্মচারি তৈরি করা এবং সাথে সাথে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব হ্রাস করা। তারা ভারতের মানুষকে ভারতের চিন্তা-চেতনা থেকে সরিয়ে ব্রিটিশ চিন্তা-চেতনায় গড়তে চেয়েছে।

১৮৩৫-এর ২রা ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সংসদের ভাষণে লর্ড মেকলে বলেন,

We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions whom we govern, -a class of persons Indian inblood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.

"বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা হবে, এমন একটি গোষ্ঠী তৈরি করা যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ্য প্রচারে দূত হিসেবে কাজ করতে পারে। এরা রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু মেজায, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।"](Macaulay's Minute on Education, February ২, ১৮৩৫)

মেকলে তার পিতার নিকট ১৮৩৬ ঈ. লিখিত এক চিঠিতে বলেন,

"আমাদের পরিচালিত ইংরেজী স্কুল দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করছে। এমনকি বর্তমানে ছাত্র সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ শিক্ষা হিন্দুদের উপরই সর্বাধিক প্রভাব ফেলছে। কোনো হিন্দু ইংলিশ পড়ার পর নিজ ধর্মের উপর প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী থাকতে পারে না। আমার পূর্ণ বিশ্বাস হলো, যদি আমাদের এ শিক্ষাব্যবস্থা সফল হয় তাহলে বঙ্গদেশে কোনো মূর্তিপূজারী থাকবে না (সবাই পশ্চিমা হয়ে যাবে)। তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এমন হয়ে যাবে। 'মিশনারীদের' কোনো প্রকার প্রচারণা ছাড়াই।"(B. C. Rai History of Indian Education p. ১৩৫. সূত্র : দীনী ওয়া আসরী দরসগাহেঁ; মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, পৃ. ২৪৫।)

মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব ব্রিটিশদের এমন অসাধু চিন্তা নিয়ে সুন্দর একটি আলোচনা করেছেন। তার আলোচনার সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা সমীচীন মনে হচ্ছে।

তিনি বলেন,

'পাক-ভারতে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম মি. চার্লস গ্রান্টের লিখিত নিবন্ধ পাওয়া যায়। ১৭৯২ হইতে ১৭৯৭ পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময় ধরিয়া তিনি উক্ত নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি এ রচনায় ভারতীয়দের সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া তাহাদেরকে বর্বর, ডাকাত, চোর ইত্যাদি আখ্যা দান করেন। অতঃপর এই দেশের অর্ধবর্বর লোকদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব পাশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

এই শিক্ষা দ্বারা বিশেষত হিন্দুরা বেশী উপকৃত হইবে। প্রথমত আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা তাহাদের মাঝে যাত্রা শুরু করিতে হইবে। ছোট ছোট বুকলেট এবং পুস্তিকায় এ সব সন্নিবেশিত আছে। সর্বাগ্রে তাহাদেরকে একত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। মানবসভ্যতার সত্যিকার ইতিহাস এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাহাদেরকে অবহিত করিতে হইবে। তাহাদের পূর্বেকার সকল মতবাদ নস্যাৎ করিবার জন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা যথার্থই মিথ্যা। অতঃপর তাহাদেরকে পবিত্র এবং উত্তম কর্তব্যাদির প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ধাবিত করিতে হইবে। পাপ, পূণ্য, শাস্তি এবং পরকাল সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতে হইবে। এ ধরণের শিক্ষা যেইখানে শুরু হইবে স্বভাবতই সেইখানে মূর্তিপূজা, কাঠ এবং মাটির তৈরী প্রতিমার উপাসনা চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। (History of english education in india by sayed Mahmud, P-১৩.)

এই দেশের ধর্মীয় স্বরূপ বিকৃত করিয়া খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তন করার জন্য মি. গ্রান্ট যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তাহা কতটুকু বাস্তবে রূপ লাভ করিয়াছে তাহা ১৮৩১ সালে প্রকাশিত শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট হতেই প্রতীয়মান হয়।

"হিন্দু কলেজের (রাজা রামমোহন রায়ের কলেজকে হিন্দু কলেজও বলা হইতো) সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের প্রতি এই কমিটির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইহার ফলশ্রুতি যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ আশাতীত। ইংরেজী ভাষা রপ্ত করার পাশাপাশি নৈতিক উন্নতি যথেষ্ট সাধিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছাত্ররা এবং যথার্থ যোগ্য হিন্দু ছাত্ররা নিজেদের তথাকথিত ধর্মের আবেষ্টনি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রকাশ্যভাবে নিজেদের ধর্মের অসারতা সম্পর্কে মন্তব্য করিতেও দ্বিধা করে না। সম্ভবত পরবর্তী বংশধরদের মাঝে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদেরই আরও উৎকর্ষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে।

এখানেও ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের কোনো উল্লেখ করা হয় নাই। আসলে তাদের অভিযান উভয় জাতির বিরুদ্ধেই ছিল। কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের মতবাদ এবং ধর্ম বিশ্বাসে তেমন অটল ছিল না বলিয়া ইংরেজদের মিশন তাহাদের মাঝে বেশী কার্যকরী হয় এবং প্রকাশ্যে বলিবার মত হিন্দুদের সম্পর্কেই তাহাদের কিছু বক্তব্য ছিল। পক্ষান্তরে, মুসলমান তাহাদের মতবাদ এবং ধর্ম বিশ্বাসের বেলায় সম্পূর্ণ আপোষহীন ছিল। এই জন্য মুসলমানদের ব্যাপারে তাহারা অত্যন্ত হুশিয়ার এবং সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। মি. গ্রান্টের এ মিশন তথা ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের কী অভিসন্ধি ছিল স্যার চার্লস ট্রিভল্যান নামক জনৈক ইংরেজ অফিসারের প্রদত্ত বিবরণে তাহা আরও সুস্পষ্ট হয়। ১৮৫৩ সালে পার্লামেন্টের সব কমিটিতে প্রদত্ত এই বিবরণের অংশবিশেষ নিম্নে দেওয়া হইল:

"দেশের বর্তমান প্রচলন এবং রেওয়াজ অনুযায়ী মুসলমানরা আমাদেরকে অভিশপ্ত কাফির এবং বিধর্মীদের দলভুক্ত মনে করে। যাহারা বলপূর্বক একটি সমৃদ্ধিশালী ইসলামী সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে এবং প্রচলিত ধর্মীয় বৈষম্য অনুযায়ী হিন্দুরাও আমাদেরকে ম্লেচ্ছ বলিয়া আখ্যায়িত করে। অর্থাৎ ইহাদের সাথে কোনরকম সম্পর্ক রাখা অসমীচীন। এই উভয় জাতি মনে করে আমরা বলপূর্বক তাহাদের সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছি। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমরা হরণ করিয়াছি। এমতাবস্থায় ইহাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের অর্থ দাঁড়াইবে তাহাদের মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া। যেই সব নবীন যুবক আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করিবে পূর্বেকার ধারা অনুযায়ী তাহারা প্রচলিত নিয়মে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার কথা ভুলিয়া যাইবে। অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তাহারা তখন দেশের সকল পর্যায়কে পাশ্চাত্য রঙ্গে রঙ্গিন করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইবে।

চার্লস ট্রিভলেন পুনরায় বলেন,

আমার মতে যে সব স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে সেগুলিতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য করা উচিত। আমার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, এমন দিন কোনো সময়ই আসিবে না যখন সরকারী কলেজসমূহেও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা চালু করা যাইবে। আমার মতে এমন উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে যেদিকে লোকেরা সহজেই আকৃষ্ট। ইহাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই যে, খ্রিস্টধর্মভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া কোনো শিক্ষাই পরিপক্ক এবং সুষমপূর্ণ নয়। ভারতের একটি অংশ যখন সুশিক্ষিত হইবে তখন আমাদের উচিত হইবে খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষা চালু করা। কিন্তু আমাদেরকে এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। যাহাতে সৈন্যবাহিনীর মাঝে কোনরকম অসন্তোষ না জাগে। কলিকাতা হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্বে আমি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী এদেশীয় উচ্চ শিক্ষিত এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করিয়াছিলাম। এই সব ব্যক্তি হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করিত। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের মূলে ইহাদের প্রচুর সাধনা এবং সহযোগিতা রহিয়াছে। ইহাদিগকে কিভাবে খ্রিষ্টান করিতে হইবে, লোকেরা তাহার কোন ফন্দিই জানে না। আমার তো বিশ্বাস আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন সকলেই গোত্রবন্দি হইয়া খ্রিস্টান হইয়াছেন এখানকার লোকেরাও দলে দলে খ্রিস্টান হইতে বাধ্য। এই দেশে পরোক্ষভাবে পাদ্রীদের দ্বারা এবং প্রত্যক্ষভাবে বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং ইংরেজদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মেলা-মেশার দ্বারা খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তিত হইতে পারে।(History of english education in india by sayed Mahmud, P-৬৯)

এই বিশিষ্ট ইংরেজ নাগরিক দেশের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য এবং গভর্নরও ছিলেন। তাহার উপরোক্ত মতামতে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার জিগির সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্যদিকে এই ব্যক্তি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কতখানি আশাবাদি, তাহার বর্ণনা হইতেই অনুমান করা যায় যে, স্কুল-কলেজের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কি? তাহাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আসল উদ্দেশ্য হইল, স্কুল-কলেজে হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্মের কোন শিক্ষা দেওয়া চলিবে না। বরং সে স্থলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খ্রিস্টান ধর্মের অনুশীলন চলিবে। এই প্রয়াস ধর্মনিরপেক্ষ নয়, এই কথাও বলা যায় না। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষা-নীতিতে ধর্মশিক্ষার ব্যাপার উহ্য রহিয়াছে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিবে। দ্বিতীয়ত, পুরোনো রীতির শিক্ষায়াতনগুলির দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে এবং এই শিক্ষা-নীতির দোষ-ত্রুটি বাহির করিতে শুরু করিবে। ফলে জনসাধারণ এই শিক্ষার বিরোধিতা করিতে শুরু করিবে। কেননা, জনসাধারণ যখন দেখিবে, এই শিক্ষার কোন বাস্তব লাভ নাই তখন স্বাভাবিকভাবেই ইহার প্রতি তাহারা অনীহা প্রদর্শন করিবে। ইহার পরও যে সব ধর্ম উৎসর্গপ্রাণ ইহার স্বপক্ষে সংগ্রাম করিবে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য এই শিক্ষার দোষ ত্রুটি প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদের নিজস্ব (স্থানীয়) ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে। ইহার পর যুবক শিক্ষানবীশরা নিজেদের ধর্মের প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ হইবে এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে খ্রিস্টধর্মের জালে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।

তাহাদের এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সাফল্য সম্পূর্ণ সন্তোষজনক এবং তাহা চতুর্দিকে ডাল-পালা বিস্তার করিতেছে। তাহাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, পুরোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সংস্কার। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আলিয়া মাদরাসার উপর পড়িল। (আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, আবদুস সাত্তার পৃ.৬১-৬৯)

তার এ আশা পূর্ণ হয়েছে। জেমস জে. নোভাক বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে Bangdesh reflection on the water (বাংলাদেশ জলে যার প্রতিবিম্ব) রচনা করেন। এতে তিনি লিখেছেন,

'বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির অনেক আচার-প্রথা এমনভাবে ঢুকে গেছে যে তা থেকে বাংলাদেশকে আলাদা করা যাবে না।'(বাংলাদেশ জলে যার প্রতিবিম্ব, পৃ. ১৭২ (বিস্তারিত দেখুন, "ইংরেজমুগ্ধ মন" শিরোনামে আলোচনা ১৬৭-১৭৩))

সংঘাতের মুখে মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

ইসলাম একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় পূর্ণ অটল ও অবিচল। সুতরাং মুসলিম অর্থই হলো সে সকল অনৈসলামিক কাজ থেকে মুক্ত। নিজ জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে তাকে ইসলাম নিয়ে আপোষহীন থাকতে হবে।

অন্যদিকে পশ্চিমা ও সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিমদের জীবনকে বিভক্ত করে দিয়েছে। নিছক ব্যক্তিজীবন ছাড়া সর্বক্ষেত্রে তাকে বানিয়ে দিয়েছে অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনার ধারক বাহক। শুরু হয়েছে বিশ্বাস ও শিক্ষার সংঘাত। ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে পড়াশোনা করে একজন মুসলিম নিজেই নিজের বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সংঘাত আর টানাপোড়েনের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে তার চিন্তা ও মন। তার জীবন হয়ে উঠে সংঘাতমুখর।

এভাবেই মুসলিমরা বস্তুবাদী চিন্তার শিকার হয়। বস্তুবাদী শিক্ষানীতি ও ইসলামী শিক্ষানীতি কিভাবে এক হতে পারে? ইসলাম ও জাহিলিয়াত কীভাবে একসাথে বসবাস করতে পারে? অন্ধকার ও আলোর সংমিশ্রণ কীভাবে হতে পারে? কারণ দুটির প্রকৃতি ও চেহারা দু'দিকে। দু'ব্যক্তির চেহারা দু'দিকে থাকলে তাদের পিঠ মিলতে পারে; চেহারা নয়। সুতরাং এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সম্ভব নয়। হয়তো এ প্রান্ত না হয় ঐ প্রান্ত। হয়তো পূর্ব না হয় পশ্চিম।

এ সংঘাত নিছক শাখা-প্রশাখায় নয়; বরং কেন্দ্রের গভীরে। সুতরাং মূল নীতি বা কেন্দ্র অপরিবর্তিত রেখে দু'একটি পাঠ্য বই সংযোজন-বিয়োজন কখনই এর সমাধান নয়। এমনিভাবে নিছক 'ধর্মীয়' শিক্ষা বাধ্যতামূলক করাও স্থায়ী কোনো সমাধান নয়। বরং পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে, প্রথম ক্লাসে শিখবে, আল্লাহই আমাদের স্বতন্ত্রভাবে সম্মান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর দ্বিতীয় ক্লাসে পড়বে ডারইউনের বিবর্তনবাদ; মানুষ পশু থেকে জন্ম নিয়েছে। এমনিভাবে এক ক্লাসে পড়বে, আল্লাহ প্রথম মানবকে উন্নত শিক্ষা ও সভ্যতা দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। অন্য ক্লাসে শিখবে, প্রাচীন মানুষ ছিলো শিক্ষা ও সভ্যতাশূন্য। এভাবে সংঘাত আরও ঘনীভূত হবে এবং স্বাভাবিক কারণেই বস্তুর সামনে অহীর দুর্বলতা দৃষ্টিগোচর হবে। আর মৃত্যুবরণ করবে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা।

অনেক জরিপের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত অধিকাংশ ছাত্রদের মাঝে এক ধরনের সংশয় কাজ করে। সংশয় না থাকলেও তারা একধরনের অস্বস্তি বোধ করে। বর্তমান জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে লর্ড মেকলের মত করে বলা যায়, এরা নামে মুসলিম হলেও চিন্তায় ইউরোপীয়। তারা ক্রমশই ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। নতুন এক মানসিকতায় জন্ম নিচ্ছে। বাস্তবায়ন হচ্ছে 'দ্য প্রটোকল'-এর সেই ইহুদী চক্রান্ত। আল্লামা আবুল হাসান নাদাবী রাহ. (১৪২০হি.) এর বাস্তব চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন,

ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو اسلام سے نہ صرف یہ کہ بیگانہ تھا، بلکہ اس کو اس سے ایک طرح کا بعد اور وحشت تھی،،، ارے بھئی! اگر کچھ لوگ شراب پیتے ہیں تو پھر اس میں کون سی ایسی مصیبت آئی، اور اگر ٹیلی ویژن پر یہ سب کچھ دکھلایا جاتا ہے، اور اس سے لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے اور ایسی کیا قیامت آجاتی ہے؟

وہ کھائیں پئیں، دکان اور کاروبار کریں، دولت پیدا کریں، ان کو اس سے کیا تعلق ہے، مذہب تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے،

ان کے استادوں نے اور مغرب کی یونیورسٹیوں نے ان کے دل ودماغ میں یہ بات اتار دی ہے کہ مذہب تو ایک شخصی معاملہ ہے، اور مذہب کی بقا بھی اسی میں ہے کہ شخصی معاملہ رہے

"এমন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠেছে যারা শুধু ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এমন নয়, বরং তারা ইসলাম থেকে দূরত্ব ও ঘৃণ্য মনোভাব রাখত। (ভাবটা এমন) আরে ভাই! কিছু মানুষ শরাবমত্ত হয়ে পড়লে অসুবিধে কোথায়, টেলিভিশনে সবকিছু প্রদর্শিত হলে ছেলে-মেয়েদের চরিত্রে কুপ্রভাব পড়ার কারণে কি কিয়ামত ঘটিত হয়ে যাবে?।

তারা খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা বাণিজ্য করবে, সম্পদ-বৈভবের অধিকারী হবে। ধর্মের সাথে তাদের কী সম্পর্ক? ধর্ম তো নিছক একটি ব্যক্তিগত বিষয়।

তাদের শিক্ষক ও পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ব্রেইন ওয়াশ করে এ কথা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত বিষয়। আর ধর্ম টিকে থাকতে হলে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়েই থাকতে হবে।" (নিযামে তালীম: আবুল হাসান নাদবী রাহ. পৃ. ১৬।)

আজ আমাদের দেশের দিকে তাকালে এর পূর্ণ সত্যতা দেখতে পাই। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র এমন চিন্তাধারী শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই যারা সর্বদা ইসলামের ক্ষেত্রে শিথিল মনোভাব পোষণ করে। আর রক্ষণশীলদেরকে ধর্মান্ধ বলে দোষারূপ করে। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাওফীক দান করুন।

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা: এক প্রকার ঈমানবিধ্বংসী রসায়নিক উপাদান

জাতির উত্থান ও পতনের মূলে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার বড় ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা রসায়নিক উপাদানের মত যা খুব সহজে একটি জাতির চিন্তা-চেতনায় বিক্রিয়া ঘটায়। তাই কোনো জাতির মূলে পরিবর্তন করতে হলে তার শিক্ষাকে পরিবর্তন করতে হবে। এমনিভাবে কোনো জাতিকে বিকলাঙ্গ করতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের চিন্তাকে বিকলাঙ্গ করতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করে পশ্চিমারা দ্বান্দ্বিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে অসার চিন্তা আর চেতনার সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পেছনের বিভিন্ন আলোচনায় তা ফুটে উঠেছে।

বিশিষ্ট দার্শনিক কবি মুহাম্মাদ ইকবাল রাহ. (১৯৮৩ঈ.) তাদের এ অপকৌশল স্বচক্ষে দেখে তার জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর উন্নতির জন্য ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। তিনি পশ্চিমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে 'তীযাব' বলেছেন, যা স্বর্ণকে মাটিতে পরিণত করে। তিনি বলেন

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو

ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر

تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب

سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

"তার সত্তা ও চিন্তা-চেতনাকে শিক্ষাব্যবস্থা নামক এসিডে সমর্পন করো, তাহলে তা অনুগত হয়ে যাবে এবং তুমি যেকোনো দিকে ফিরাতে পারবে।

প্রভাব ক্রিয়ায় রসায়নকেও ছাড়িয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা নামক এ এসিড। যা স্বর্ণের হিমালয় পর্বতকে মাটির টুকরোয় পরিণত করতে পারে।"(নিযামে তালীম: আবুল হাসান নাদবী রাহ. পৃ. ১৮।)

বলাবাহুল্য, এমন 'তীযাবীয়' শিক্ষাব্যবস্থার উপর আস্থা রাখা মানেই দেশ ও জাতির নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির বিসর্জন দেয়া। ভারতে যখন স্যার সাইয়্যেদ আহমাদ খান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রিটিশদের আদলে ইসলামী শিক্ষা চালু করেছিল তখন তার প্রতিবাদে কবি আকবার ইলাহাবাদীসহ আরও অনেকে এমন মন্তব্য করেছেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, তার এ শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দিবে। পরবর্তীতে তা প্রমাণিতও হয়েছে।(বিস্তারিত জানতে দ্র. আফকারে আলম-মাওলানা আসীর আদরাবী ১/৩৬৫-৩৯৭, প্র. শাইখুল হিন্দ একাডেমী, দারুল উলূম দেওবন্দ।)

ড. মুহাম্মদ আসাদ (১৯৯২ঈ.) সুন্দরই বলেছেন,

'পাশ্চাত্য সভ্যতাই মুসলমানদের স্থবির সভ্যতাকে নবজীবন দান করার মতো একমাত্র শক্তি মনে করে মুসলিমরা যতোদিন সেদিকে তাকিয়ে থাকবে ততোদিন তারা তাদের আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করবে এবং পরোক্ষভাবে এই পাশ্চাত্য মতবাদকে সমর্থন করে যাবে যে, ইসলাম হচ্ছে একটি ক্ষয়িত শক্তি।'(সংঘাতের মুখে ইসলাম পৃ. ৫৭।)

চিন্তাশীলদের অজানা নয় যে, দ্বান্দ্বিক চিন্তা চেতনা নিয়ে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। সংঘাত মানুষকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। এটাই হলো পশ্চিমাদের অপকৌশল। তারা চায় আমরা সংঘাতে থাকি, আর তারা শাসন করুক।

মুসলিমরাই কেন সংঘাতের মুখে?

প্রশ্ন হতে পারে, সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচ্যের হিন্দু ও খ্রিস্টানরাও গ্রহণ করেছে, তারা কেন সংঘাতে নিপতিত হলো না। আমরাই কেন সংঘাতের থেকে গেলাম?

অনেকে এভাবে কৌতূহল প্রকাশ করে থাকেন। এ কৌতুহলের মূল কারণ হলো, বিষয়টিকে গভীর থেকে না ভাবা এবং ইসলাম ও ইউরোপের স্বভাব ও প্রকৃতির পার্থক্য চিন্তায় অনুপস্থিত থাকা। প্রকৃত কথা হলো, প্রচলিত খ্রিস্টবাদে দীন ও দুনিয়ার মাঝে কোনো সংঘাত নেই। তাদের দৃষ্টিতে দুটির রাজত্বই ভিন্নভাবে একসাথে চলতে পারে। তাদের বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে,

Give to the emperor the things that are the emperor's, and to God the things that are God's.

'যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও। (বাইবেল-নতুন নিয়ম; মথি লিখিত সুসমাচার; ২২: ২১।)

ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের অবস্থা প্রায় এমনই। তাই এদের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার কঠিন কোনো সংঘাত পরিলক্ষিত হয় না। শিক্ষা দর্শনে স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদাবী রাহ. (১৪২০হি.) সুন্দরই বলেছেন। তিনি বলেন,

بات یہ ہے کہ جو فلسفہ تعلیم ان غیر اسلامی ممالک میں آیا، وہاں کے اقدار اور بنیادی عقائد سے متصادم نہیں تھا، ان اقدار میں اول تو جان نہیں تھی، جان تھی بھی تو ان میں ہر نئے فلسفے کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، ان کی تو بنیاد ہی مستحکم نہیں، بہت سیال ور قیق قسم کی چیزیں ہیں

مثلا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب جواہر لال صاحب سے پوچھا گیا کہ ہندو کی کیا تعریف ہے؟ تو انھوں نے بہت سوچنے کے بعد کہا کہ جو اپنے کو ہندو کہے وہ ہندو ہے'

ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، وہ محکمہ تعلیم کے آدمی تھے، کہ ہم لوگ اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے ایک ہندو پروفیسر دوست سے کہا: پروفیسر صاحب، ہم سے اگر پوچھا جائے کہ دو لفظوں میں اسلام کا خلاصہ بیان کردو تو ہم کہیں گے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دو لفظوں میں آپ ہندوئیت کی تعریف کردیجئے تو آپ کیا کہیں گے؟

اور دیکھئے گہرے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، میری لائبریری میں بہت سی کتابیں ہیں، میں پڑھ لوں گا، آپ تو اس وقت دو لفظوں میں بتادیجئے کہ اگر مجھ سے ہی کوئی پوچھے کہ ہندو کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا تعریف ہے، تو میں کیا جواب دوں؟

تھوڑی سوچتے رہے، کہنے لگے: اصل بات یہ ہے کہ جو کسی چیز میں Believe نہیں کرتا وہ بھی ہندو ہے، اور جو ہر چیز میں Believe کرتا ہے وہ بھی ہندو ہے

تو ان کا نظام عقائد اگر ہے تو وہ اتنا روادار ہے کہ ہر فلسفہ کا ساتھ دے سکتا ہے، اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں، اس لئے فرض کیجیے کہ مغرب کا نظام تعلیم جب ہندوستان میں آیا تو اس نے ہندو سوسائٹی میں کوئی بے چینی پیدا نہیں کی، کچھ پرانے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ سمندر کا سفر نہیں کر سکتے، صبح کا نہانا ضروری ہے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، اس کے اندر کیا جان ہے؟

تھوڑے دنوں کے اندر معلوم ہو گیا کہ ہم نے بے سوچے سمجھے باتیں قبول کر لی تھی، یہ موجودہ تمدن کے ساتھ نہیں چل سکتیں،

لیکن اصل مسئلہ پیش آیا ہمارے مسلم معاشرہ کو، وہاں توحید کا ایک مفہوم ہے، اس کے متعین حدود ہیں، کہ یہاں تک ایمان ہے، اس کے بعد کفر کی سرحد شروع ہو جاتی ہے،

ایک وقت میں آدمی کئی مذاہب کا وفادار نہیں ہو سکتا، بیک وقت آدمی توحید و شرک کو جمع نہیں کر سکتا، اور یہ خیال کہ مغرب سب کچھ ہے، اور وہی قیادت کا اہل ہے، پھر اس کے بعد رسول اکرم کو دائمی و عالمی رہنما اور معیار ماننا...

“কথা হল, অনৈসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে যে শিক্ষাদর্শন এসেছে তা সেখানকার মূল্যবোধ এবং মৌলিক চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না।

প্রথমত, তাদের নিজস্ব মূল্যবোধের মাঝে কোনো প্রাণই ছিল না। আর থাকলেও তাদের মাঝে নিত্য-নতুন দর্শন গ্রহণের প্রবণতা ছিল। তাদের ভিত্তিমূলই ছিল নড়বড়ে। অনেকটা ভাসমান ও ঢিলা প্রকৃতির। উদাহরণস্বরূপ আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেই জওহার লাল সাহেবের কথা। যখন তাকে ‘হিন্দুর’ পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হল, অনেক ভেবে-চিন্তে উত্তর দিলেন, ‘যে নিজেকে হিন্দু বলে সেই হিন্দু।’

আমার এক বন্ধু একটি ঘটনা শুনালেন। তিনি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের একজন সদস্য। বললেন, ‘একবার আমরা স্টাফরুমে বসা ছিলাম। আমি এক হিন্দু প্রফেসর বন্ধুকে বললাম, প্রফেসর সাহেব! আমাদেরকে দু’ শব্দে ইসলামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে বলব, লা ইলাহা ইল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’। এখন যদি আপনাকে এরূপ সংক্ষিপ্তাকারে হিন্দু ধর্মের পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয় তখন আপনি কী বলবেন?

দেখুন, এখানে দর্শনগভীরতা নিস্প্রয়োজন। আমার লাইব্রেরীতে অনেক কিতাব রয়েছে। আমি পড়ে নিব। এখন আপনি শুধু এটুকু বলুন, আমাকে কেউ দু’বাক্যে হিন্দু ধর্মের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে কী বলব?

কিছুক্ষণ চিন্তা-ফিকির করে বললেন, আসল কথা হলো, যে কোনো কিছুতে বিশ্বাসী নয় সেও হিন্দু; আবার যে সব কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করে সেও হিন্দু!

তো যদি তাদের বিশ্বাস থেকেই থাকে তাহলে তা এতই নমনীয় যে, যেকোনো দর্শনের সঙ্গ দিতে পারে। কোনো প্রকারের সংঘর্ষ ছাড়াই। তাই দেখুন, যখন হিন্দুস্তানে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা আরোপিত হলো তখন তা হিন্দু সমাজের মাঝে কোনো অস্থিরতা সৃষ্টি করেনি। কিছু সনাতন লোকেরা বলত, সমুদ্র ভ্রমণ করা যাবে না। প্রত্যুষে স্নান করতে হবে। স্নান ব্যতিত আহার নেই। আর এসব ছিলো নিস্প্রাণ। কিছুদিন পর ধরা পড়ল, আমরা বোধহীন হয়ে তাদের অনুসরণ করে চলছি। এ সবকিছু বর্তমান সভ্যতার সামনে টিকবে না।

কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হলো আমাদের মুসলিম সমাজে। আমাদের তাওহীদের মর্মই একটি। তার রয়েছে নির্ধারিত সীমারেখা। এ পর্যন্ত ঈমান, আর তা অতিক্রম করলেই সূচনা হয় কুফরের।

একই সময়ে মানুষ একাধিক ধর্মাবলম্বি হতে পারে না। একত্ববাদ ও অংশীবাদ একই সাথে গ্রহণ করা যায় না। আর এ চিন্তাও একসাথে পোষণ করা যায় না যে, পশ্চিমারাই হবে সবকিছু, তারাই নেতৃত্বের যোগ্য, আবার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বৈশ্বিক ও চিরন্তন রাহবার হিসেবে গ্রহণ করা।" (নিযামে তালীম পৃ.১৩-১৪।)

ব্রিটিশ-ভারত এবং স্বাধীন ভারত ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পিছনে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে এ কথা ফুটে উঠেছে যে, তারা ভারতের মানুষকে ধর্মান্তরিত করা এবং তাদের ভক্ত ও ভীতু বানানোর জন্য ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করেছিল। মুসলমানরা তাদের এ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও হিন্দুরা সাদরে গ্রহণ করে। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাদের সেক্যুলার ও মিশনারী শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করে। অন্যদিকে মুসলিমরা ছিলো শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সংঘাতে আক্রান্ত। মুসলমানদের মাঝে যারা ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তারা ক্রমে ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়েছে। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী রাহ. (১৩৭৫হি.) এর বক্তব্যেও এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতির দিক উঠে এসেছে,

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے برخاست ہوجانے کے بعد حکومۃ مسلطۃ نے تعلیم کا جو نظام ملک میں (اسکولوں اور کالجوں وغیرہ) کے نام سے قائم کیا، مشاہدہ بتارہاہے کہ اس نظام کی تعلیم سے استفادہ کرنے والے مسلمانوں میں بتدریج اسلامی زندگی سے بعد پیدا ہوتا چلا جارہاہے، یہ واقعہ ہے کہ جن خاندانوں نے جدید تعلیم تیسری اور چوتھی پشت میں اسوقت تک پہنچ چکی ہے، ان میں اسلام کا صرف نام رہ گیاہے، عام ابتدائی باتیں بھی ان لوگوں کو اسلام کے معلوم نہیں، یہ سنی ہوئی نہیں دیکھی ہوئی بات ہے۔

"ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনক্ষমতা হারানোর পর ক্ষমতাধর ব্রিটিশরা স্কুল ও কলেজের নামে এ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে, বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, এ শিক্ষাধারী মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বাস্তবতা হলো, এ নব্য শিক্ষাধারীদের তৃতীয় চতুর্থ প্রজন্ম এমন হয়েছে, তারা শুধু নামসর্বস্ব মুসলিম আছে। ইসলামের প্রাথমিক সাধারণ বিষয়গুলো সম্পর্কেও অজ্ঞ। এটি শ্রুতকাহিনী নয়; প্রত্যক্ষদর্শিত বাস্তবতা।" (হিন্দুস্তান মেঁ মুসলামনূঁ কা নেযামে তালীম ওয়া তারবিয়াত-মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী রাহ. ২/৪০১ প্র. মাকতাবাতুল হক, মুম্বাই।)

অবশেষে ১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থায় মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাও মুসলিমদের অনুকূল ছিলো না। যার দরুন ভারতের চিন্তাবিদ উলামায়ে কিরাম মূল শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্নভাবে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

১৯৭১ সনে আমাদের দেশ স্বাধীন হলো। জাতিকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে কমিশনের সদস্যবৃন্দ ভারত সফর করেন। কমিশনের সদস্যগণ একমাস ব্যাপী ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে এ কমিশন সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

ড. কুদরত-ই-খুদার কমিশন গড়ে উঠেছিলো সেক্যুলার ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায়। এ কমিশনে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু ছিলো তা এ ধারা থেকেই বোঝা যায়- 'প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হবে।' (অধ্যায় ৭.১০)। পরবর্তীতে ধর্মীয় শিক্ষাকে সংযোজন করলেও মূল ভাবধারা পূর্বেরটিই বাকী থাকে। যা থেকে আমরা এখনো বের হতে পারিনি। ফলে এখনও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বান্দ্বিক ও দ্বিমুখী হয়ে আছে।নর্জাগরণের প্রচেষ্টা]

ভারত উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণের প্রয়াস

মুসলমানদের এ পতন থামানোর জন্য প্রয়োজন ছিলো স্বতন্ত্র ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা। যেখানে ইসলামী উলূম তথা উলূমে নাকলিয়া ও আকলিয়া ইসলামী ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা দেয়া হবে। বৈরী পরিবেশে ব্যাপক কাজ করার সুযোগ না থাকায় হযরত কাসেম নানুতভী রাহ. ইসলামের উলুমে নাকলিয়ার জন্য ১৮৫৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ নামে স্বতন্ত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

দারুল উলূমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় উলূমে নাকলিয়ার শিক্ষাদানের সূচনা হয়। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে এতে অভূতপূর্ব কামিয়াবী অর্জিত হয়। এই দারুল উলূমের মাধ্যমেই মূলত ভারত উপমহাদেশে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে যায়। অন্যথায় এখানেও ইসলাম ধর্মের শিক্ষা হতো প্রাচ্যবিদদের ভাবধারায়, এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হতো তাদের চিন্তা-চেতনার অনুকরণে। যেমনটি হচ্ছে কোনো কোনো মুসলিম দেশে। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ইসলাম ধর্ম পড়ানো হয়। । অনেক ইউনিভার্সিটিতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে স্বতন্ত্র অনুষদও রয়েছে; তবে তা সম্পূর্ণ প্রাচ্যবিদদের নীতি ও ফর্মুলার আলোকে।(দারুল উলূম দেওবন্দের এ প্রচেষ্টা জারী না থাকলে হিন্দুস্তানের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিণতি বাগদাদের মতই হয়ে যেত। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফি. বাগদাদের মাদারিস সম্পর্কে বলেন, 'আমি বাগদাদে গিয়েছিলাম। বাগদাদ একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম নগর। বহু শতাব্দী এ নগর ছিলো মুসলিম জাহানের রাজধানী। আব্বাসী খেলাফতের শান-শওকত এ জগৎ এককালে সেখানে প্রত্যক্ষ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় একদার সরগরম সেই মহানগরে যখন আমি পৌঁছাই, বড় কৌতূহল জাগলো কোনো মাদরাসা সম্পর্কে জানার ও তা পরিদর্শন করার। জিজ্ঞেস করালাম, এখানে কোনো মাদরাসা আছে? এমন কোনো দীনী প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ইলমে দীনের তালীম হয়? যদি থাকে আমি সেখানে যেতে চাই।

উত্তর পাওয়া গেল, এখানে এ রকম কোনো মাদরাসার নাম-নিশানাও নেই। যা ছিলো সবই স্কুল-কলেজে রূপানÍরিত হয়ে গেছে। দীন শেখার জন্য এখানকার ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইসলামী ফ্যাকাল্টি আছে। তাতে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয় বটে কিন্তু তার সূরতহাল বড় বেদনাদায়ক। শিক্ষকদেরকে দেখলে তাদেরকে আলেম বলে অনুমান করা কঠিন। বরং সন্দেহ জাগে, তারা আদৌ মুসলিম কি না? সেসব ফ্যাকাল্টিতেও সহশিক্ষাই চলছে। ছেলে-মেয়েরা একত্রে মিলেমিশে পড়াশুনা করছে। তাতে ইসলাম কেবল একটা মতবাদ হিসেবেই টিকে আছে। কেবল ঐতিহাসিক দর্শন হিসেবে তা পড়ানো হয়। জীবনপ্রণালীতে তার কোনো আসর দেখা যায় না। ওরিয়ান্টলিস্টদের লেখাপড়ার সাথে তাদের কোনও পার্থক্য নেই। আজ আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের ইউনিভার্সিটিগুলোতেও ইসলামী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় তাতে পড়ানো হয়। কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদির তালীম দেয়ার ব্যবস্থা আছে।
...

পাশ্চাত্যের ওসব শিক্ষাকেন্দ্রে শরঈ কলেজ ও উসূলুদ দীনের কলেজও আছে। কিন্তু তার শিক্ষার্থীদের জীবনে সে শিক্ষার কোনো আসর নযরে আসে না। বস্তুত তাতে যা আছে, তা শিক্ষার খোলসমাত্র। কিছুমাত্র সারবস্তু নেই। ইলমে দীনের রূহ থেকে তা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। (ইসলাম ও আমাদের জীবন ১৩/৫২-৫৩ প্র. মাকতাবাতুল আশরাফ)

দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম নানুতুবী রাহ.-এর ইচ্ছা ছিলো, ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমানদের প্রণয়নকৃত দর্শন ও বিজ্ঞানের মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সে ইচ্ছাকে সামনে রেখে একটি শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। তিনি ১৯ যী'কাদা ১২৯০হি. মোতাবেক ৯ জানুয়ারি ১৮৭৪ ঈ. সনদ ও পুরষ্কার বিতরণী মাহফিলে দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সিলেবাসবিষয়ক উত্থাপিত নানা প্রশ্নের জবাব দেন। সে বক্তব্যে তিনি বলেন,

علوم نقلیہ،اوران کے ساتھ علوم دانش مندی کو داخل تحصیل کیا۔

[উলূমে আকলিয়ার সাথে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।](সাওয়ানেহে কাসেমী: মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী ২/২৭৫, ২৮১ মাকতাবা দারুল উলূম, দেওবন্দ।)

দারুল উলুমের প্রাথমিক পর্যায়ে দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার নমুনা কেমন ছিলো তা এক ব্রিটিশ পরিদর্শকের রিপোর্টে উঠে এসেছে। তিনি ১৮৭৫ সালে গভর্নরের পক্ষ থেকে দেওবন্দ মাদরাসার শিক্ষা কারিকুলাম ও শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে রিপোর্ট করার দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ পরিদর্শন করে বলেন,

یہاں سے آگے بڑھا تو ایک جگہ صاحب میانہ قد نہایت خوب صورت بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بڑی عمر کے طلبہ کی ایک قطار تھی، قریب پہنچ کر سنا تو علم مثلث کی بحث ہو رہی تھی، میرا خیال تھا مجھے اجنبی سمجھ کر یہ لوگ چونکیں گے، لیکن کسی نے مطلق توجہ نہ دی، میں قریب جا کر بیٹھ گیا اور اسننے لگا، میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، جب میں نے دیکھا کہ علم مثلث کے ایسے ایسے عجیب اور مشکل قاعدے بیان ہو رہے تھے، جو میں نے کبھی ڈاکٹر اسپرنگر سے بھی نہیں سنے تھے،

یہاں سے اٹھ کر میں دوسرے دالان میں گیا تو دیکھا ایک مولوی صاحب کے سامنے طالب علم معمولی کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے، یہاں اقلیدس کے چھٹے مقالے کی دوسری شکل کے اختلافات بیان ہو رہے تھے اور مولوی صاحب اس برجستگی سے بیان کر رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اقلیدس کی روح ان میں آگئی ہے، میں منہ تکتا رہ گیا، اسی دوران میں مولوی صاحب نے جبر و مقابلہ ٹاڈ ہنٹر سے مساوات درجہ اول کا ایک ایسا مشکل سوال طلبہ سے پوچھا کہ مجھے بھی اپنی حساب دانی پر پسینہ آگیا، اور میں حیران رہ گیا، بعض طلبہ نے جواب صحیح نکالا۔۔۔

یہاں سے میں ایک زینے پر چڑھ کر دوسری منزل میں پہنچا،،،

میری تحقیقات کے نتائج یہ ہیں کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ، نیک چلن اور نہایت سلیم الطبع ہیں، اور کوئی ضروری فن ایسا نہیں جو یہاں پڑھایا نہ جاتا ہو۔۔۔

[একটু সামনে এগিয়ে দেখলাম মধ্যগঠনের সুদর্শন এক লোক বসা। সম্মুখে বড় বয়সী ছাত্রদের একটি সারি। কাছে গিয়ে দেখি ত্রিকোণমিতির আলোচনা চলছে। মনে করেছিলাম বিদেশী হিসেবে আমাকে দেখে তারা চমকে যাবে। কিন্তু না; কেউ আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করল না। আমি কাছে গিয়ে বসলাম। উস্তাযের তাকরীর শুনছিলাম। বিস্ময় আর আশ্চর্যে আমার চক্ষু চড়কগাছ! ত্রিকোণমিতির এমন কিছু দুর্বোধ্য, সুক্ষাতিসুক্ষ সূত্রের আলোচনা করছিলেন যা আমি ডাক্তার স্প্রিঙ্গার থেকেও শুনিনি!

এখান থেকে উঠে দ্বিতীয় ভবনে গেলাম। সেখানে একজন মৌলভী সাহেবের সামনে সাদাসিধে পরিধেয়ধারী কিছু ছাত্রকে দেখলাম। উকলীদাসের (ইউক্লিডের) ৬ষ্ঠ মাকালার শাকল-এর বাদ-মতবাদ আলোচনা হচ্ছিল। মৌলভী সাহেব অনর্গল তাকরীর করে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছে উকলীদাসের প্রাণ তার মাঝে সঞ্চার হয়েছে! বিস্ময়ে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম। মৌলভী সাহেব বীজগণিতের এমন একটি একটি কঠিন প্রশ্ন ছাত্রদেরকে করলেন যার হিসাব কষতে গিয়ে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। তবে কোনো কোনো ছাত্র এর সঠিক উত্তর প্রদান করেছে।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আরেক ভবনে গেলাম। ...

আমার পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল হলো, এখানকার সবাই শিক্ষিত। সৎ চরিত্রবান। উত্তম স্বভাবের। প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের সবগুলো এখানে পঠিত হয়।] (আর-রশীদ; তারীখে দারুল উলূমে নান্বার, দীনি মাদারিস: ইবনুল হাসান আব্বাসী পৃ ৫৪-৫৯ প্র. মাকতাবা উমর ফারূক, করাচী।)

দারুল উলূমে দর্শন ও বিজ্ঞানের কিছু বই সিলেবাসে থাকলেও মৌলিক উদ্দেশ্য ছিলো, উলূমে নাকলিয়া তথা কুরআন ও হাদীসের ইলম। ইলম ও জ্ঞানের প্রতিটি শাখা এমন বিস্তৃত যে, একই সাথে উলূমে নাকলিয়া ও আকলিয়া অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। তাই এ ধারা পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে বহাল থাকেনি। উলূমে নাকলিয়াকে প্রাধান্য দিয়েই শিক্ষাক্রম চালু থাকে এবং এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সফলতাও অর্জিত হয়। এই চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে হাজারও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মাদরাসার আলিম-তালিবে ইলমগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণের এ ধারাটি সফল হলেও তা উলূমে নাকলিয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই ইসলামী উলুমে আকলিয়া ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন ছিলো স্বতন্ত্র এক প্রতিষ্ঠান। এই লক্ষ্যে উলামায়ে দেওবন্দসহ অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদ মিলে প্রতিষ্ঠা করেন জামিআ মিল্লিয়াসহ আরও কিছু জামিআ।

কাজ শুরু হলো; কিন্তু সফলতা অর্জিত হলো না। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ কার্যকর ছিলো। তবে অন্যতম কারণ হলো, জামিআর কারিকুলাম ও পরিবেশ ইসলামীকরণ না করা। তাই যে স্বপ্নকে নিয়ে জামিআ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা অর্জিত হয়নি। সংশ্লিষ্টরাই তা স্বীকার করেছেন। এ থেকে আমাদের সহজেই বোঝা উচিত, ইসলামী নাম দিলেই ইসলামী হয় না। বরং শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন অনিবার্য প্রয়োজন।

[মক্কা ঘোষণা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণে ও. আই. সির প্রয়াস]

আলহামদুলিল্লাহ, মুসলমানদের প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। শিক্ষার এ সংকট নিয়ে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার হয় মক্কায় ১৯৭৭ সালে। Conference Of Islamic Education সেমিনারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে,

إن كل نظام تعليمي يحمل في طياته فلسفة معينة منبثقة من تصور معين، ولا يمكن فصل أي نظام تعليمي عن فلسفته المصاحبة له، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تتخذ فلسفة أو سياسة تعليمية وتربوية مبنية على تصور مغاير للتصور الإسلامي، وهو ما يحدث الآن حين الأخذ بالنظم غير الإسلامية، لأنها في النهاية تصادم التصور الإسلامي وتناقضه، وفي الوقت ذاته فإن للإسلام تصورا عاما شاملا تبنثق منه فلسفة تعليمية وتربوية قائمة بذاتها ومتميزة عن غيرها.

لذا فإن نظام التعليم الإسلامي يجب أن يقوم على أساس هذا التصور الخاص المتميز، أما الوسائل فلا ضير من الاستفادة منها في التجارب البشرية الناجحة، ما دامت لا تصادم هذا التصور ولا تناقضه.

[প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থাই নির্দিষ্ট চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত একটি দর্শনে লালিত। অবিচ্ছিন্ন সেই দর্শন থেকে তাকে পৃথক করা সম্ভব নয়। আর তাই মুসলিমদের ইসলামী চেতনা বিরোধী ধ্যান-ধারণায় লালিত কোন দর্শন, কিংবা শিক্ষানীতি গ্রহণ করা যাবে না, যা পরিলক্ষিত হচ্ছে বর্তমান অনৈসলামিক শিক্ষানীতি গ্রহণের কারণে। কারণ তা শেষ ফলে ইসলামী চিন্তা-চেতনার সাংঘর্ষিক। অথচ ইসলামের ব্যাপক ও ব্যাপ্তিময় চিন্তা-চেতনা রয়েছে, যা থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত ও স্বতন্ত্র শিক্ষা ও নৈতিক দর্শন জন্ম লাভ করতে পারে।

আর তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এ স্বতন্ত্র চেতনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠতে হবে। হাঁ, শিক্ষামাধ্যমগুলো ইসলামবিরোধী না হওয়ার শর্তে সফল ও কার্যকরী অভিজ্ঞতায় গ্রহণযোগ্য হলে তা দ্বারা উপকৃত হতে কোন বাঁধা নেই।][1]

এই সেমিনার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক জামিআ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। এর মাঝে অন্যতম হলো মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের International Islamic University।[2]

এ প্রক্রিয়া আরো জোরদার করতে O I C কর্তৃক ১৯৮১ সালে মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কনফারেন্সে এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়। সেখানে বাংলাদেশসহ মুসলিমপ্রধান দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রণ করেন। সে সেমিনারে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যা 'মক্কা ঘোষণা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর মাঝে শিক্ষা বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

6. Believing the tenets of Islam which preach that the quest of knowledge is an obligation on all Muslims we declare ourselves determined to cooperate in spreading education more widely and strengthening educational institutions until ignorance and illiteracy have been eradicated and to take measures aimed towards the strengthening of Islamic educational curricula and to encourage research and Ijtihad among Muslim thinkers and Ulema while expanding the studies of modern sciences and technologies.

We also pledge ourselves to coordinate our efforts in the field of education and culture, so that we may draw on our religious and traditional sources in order to unite the Ummah

[১] http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/4698, Memorandum Of the first world conference on muslim education at hotel intercontinental, macca, march 31 - april 8, 1977

[২] Islamization Of Knowledge . By. D. Abdul Hamid Ahmad p.19
(জ্ঞানের ইসলামায়ন: আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া মডেল-ড. আবদুল হামিদ আহমদ আবু সোলাইমান পৃ. ১৯)

consolidate its culture and strengthen its solidarity, cleanse our societies of the manifestations of moral laxity and deviation by inculcating moral virtues, protecting our youth from ignorance and from exploitation of the material needs of some Muslims to alienate them from their religion.

Believing in the need to propagate the principles of Islam and the spread of its culture, glory throughout the Islamic societies and in the world as a whole and to emphasize its rich heritage, its spiritual strength, moral values and laws conducive to progress, justice and prosperity, we are determined to cooperate to provide the human and material means to achieve these objectives. We also pledge to exert further efforts in various cultural fields to achieve rapprochement in the thinking of Muslims and to purify Islamic thought of all that may be alien or divisive.

We further pledge ourselves, within a framework of cooperation and a joint program to develop our mass-media and information institutions, guided in this effort by the precepts and teachings of Islam, in order to ensure that these media and institutions will have an effective role in reforming society, in a manner that helps in the establishment of an international information order characterized by justice, impartiality and morality, so that our nation may be able to show to the world its true qualities, and refute the systematic media campaigns aimed at isolating, misleading, slandering and defaming our nation.

[জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য - ইসলামের এই নীতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করছি যে, অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতার দূরীকরণ না করা পর্যন্ত আমরা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগী হব; ইসলামী শিক্ষা কারিকুলামকে শক্তিশালী করব এবং মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলেমদের ইজতিহাদ ও গবেষণাকে উৎসাহিত করব। সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনোলজির গবেষণাকে প্রসারিত করব।

আমরা আমাদের এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছি যে, আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টাকে সমন্বয় করব, যাতে আমরা আমাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উম্মাহ্‌কে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি; উম্মাহ্‌র সংস্কৃতিকে সংহত করতে পারি; আমাদের জাতি ও সমাজকে সব ধরনের অবক্ষয় ও বিপথগামিতা থেকে পবিত্র এবং নৈতিক গুণাবলী ও মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করতে পারি; আমাদের যুব সমাজকে মূর্খতা ও ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা থেকে হেফাজত করতে পারি এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত করার প্রকল্পসমূহ থেকে উম্মাহকে হেফাজত করতে পারি।

ইসলামের নীতি, আদর্শ এবং সংস্কৃতিক বিকিরণ ইসলামী সমাজ এবং গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি। কারণ, এর দ্বারা ইসলামী নীতিতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি রয়েছে তা প্রকাশ পাবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা বৈষয়িক উপায়-উপকরণ ও জনসম্পদ সরবরাহের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চলমান ইসলামী চিন্তার অঙ্গন থেকে যাবতীয় বিজাতীয় ও বিভেদমূলক চিন্তার উচ্ছেদের মাধ্যমে একে পবিত্রকরণ এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের চিন্তাগত ঐক্য সৃষ্টির জন্য অধিক প্রচেষ্টা ব্যয়ের প্রতিশ্রুতিও আমরা ঘোষণা করছি।

আমরা এ ব্যাপারেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, ইসলামের শিক্ষা ও মডেলকে সামনে রেখে আমাদের প্রচার-মাধ্যমসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নয়নের জন্য যৌথ কর্মসূচী ও পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করব। যাতে করে এসব মাধ্যম সমাজ সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং একটি পক্ষপাতহীন, নীতিনিষ্ঠ ও সুবিচারমূলক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এর দ্বারা উম্মাহ্‌র পক্ষে তার বাস্তব অবস্থান ও চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও তাদের ওপর সামগ্রিক অবরোধ সৃষ্টির এজেন্ডাধারী মিডিয়াকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে।[৩]

এ ঘোষণায় শিক্ষা-সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটে উঠেছে। এর মাঝে অন্যতম হলো, **শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ ও শক্তিশালীকরণ। শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা কারিকুলাম থেকে যাবতীয় বিজাতীয় ও বিভেদমূলক চিন্তা উচ্ছেদকরণ।**

[৩] http://ww1.oic-oci.org/english/conf/is/3/3rd-is-sum

শিক্ষার বিষয়ে আমাদের যেকোনো চিন্তা করার পূর্বে এই দুটি দিক নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। এ দু'দিকে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারলেই অন্যান্য ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারব। ইনশাআল্লাহ।
সর্বোপরি শিক্ষাকে ইসলামীকরণ একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। ইসলামী বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আরববিশ্বসহ মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রচুর কাজ চলছে। তবে জামিআতুল কারাবীয়্যিনের সেই আদর্শ চিত্র এখনো প্রস্ফুটিত হয়নি।

[সর্বাত্মক ও প্রাণান্তকর চেষ্টা ব্যতীত শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ সম্ভব নয়]

শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। শিক্ষা নিয়ে যারা সামগ্রিক চিন্তা করেন তারা এর গুরুত্ব অকপটে স্বীকার করেন। এ কাজে সাধারণত দু'ধরনের মানসিকতা প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে।

প্রথম. ইউরোপপ্রীতি

ইউরোপ অনুসরণকে নিজেদের সফলতা ও কামিয়াবীর চাবিকাঠি মনে করা। বড় বৈচিত্রময় এদের মানসিকতা। একদিকে তারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। অন্যদিকে চিন্তা-চেতনায় ভিন্ন জাতির অনুকরণে বদ্ধপরিকর! এমন প্রবণতা কোনো জাতির জন্যই কল্যাণকর নয়। বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য তো নয়ই!
সর্বদা আমাদের হযরত ওমর রা. এর অমর বাণী স্মরণ রাখতে হবে। তিনি বলেছেন,

إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله

[আমরা ছিলাম সর্বনিকৃষ্ট জাতি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং যখনই আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে সম্মানের পিছনে ছুটব তখনই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অপদস্থ করবেন।][৪]

মুসলিমদের প্রতি ইউরোপদের বিদ্বেষ প্রমাণিত হওয়ার পরও তাদের অনুসরণ করার মানসিকতা কোনোভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না।
এছাড়া শিক্ষানীতি ভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করা খোদ ইউরোপ বিরোধী কাজ। কারণ, ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বিষয়ক নীতি হলো, নিজেদের মতাদর্শের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা এবং ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন মতাদর্শ প্রভাবিত শিক্ষানীতি আমদানী না করা, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।
সুতরাং আমাদের উন্নতি আমাদের মত করেই হতে হবে। আমাদের শরীরে আমাদের পোশাকই মানাবে, অন্যদেরটি নয়। তবে এর অর্থ এ নয় যে, আমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে।
ড. মুহাম্মাদ আসাদের ভাষায় বলতে গেলে, "মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অর্থ মোটেই এ নয় যে, ইসলাম- শিক্ষার বিরোধী। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের এই অভিযোগের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই।...
ইতিহাস সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, ইসলাম যেমন বিজ্ঞানে অগ্রগতির প্রেরণা দিয়েছে, অপর কোনো ধর্ম কখনো তা দেয়নি। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও গবেষণা ইসলামী ধর্মশাস্ত্র থেকে যে প্রবল উৎসাহ পেয়েছে, তার ফলে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে এবং স্পেনে আরব শাসনের যুগে গৌরবদীপ্ত সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছিলো।
এ তথ্য ইউরোপের ভালভাবেই জানা উচিত। কারণ, বহু অন্ধকার শতাব্দীর পর প্রাপ্ত রেনেসাঁর চাইতে ইসলামের কাছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি কম ঋণী নয়।"[5]

দ্বিতীয়. হীনমন্যতা ও ভীতি

অনেকেই আছে যারা এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে। তবে জটিল ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় উদ্যোগ নিতে ভয় পায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো জাতির উত্থান ও উৎকর্ষের অন্তরায় হলো ভীতি ও হীনমন্যতা। সে জাতির পতন অনিবার্য যে জাতির কর্ণধার উদ্যোগ নিতে ভয় পায়। আমাদের অগ্রসর হতেই হবে, রাস্তা যত কঠিন হোক। পৃথিবীতে সর্বাত্মক ত্যাগ ছাড়া কোনো বিপ্লব সফল হয়নি। আরামে বসে নিজের রুজি-রুটির চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকলে সফল উত্থান ও উৎকর্ষ অসম্ভবই মনে হবে। তবে যারা প্রকৃত অর্থেই ইসলামী জাগরণ চায়, তাদের কাছে কোনো কিছুই অন্তরায় নয়।

---

[৪] মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন; হাকেম আবু আবদুল্লাহ নীশাপুরী রাহ. হাদীস নং ২০৭।
[৫] সংঘাতের মুখে ইসলাম পৃ. ৫৯, ৬০-৬১

আল্লামা আবুল হাসান নাদাবী রাহ. (১৪২০হি.) সুন্দর বলেছেন,

وحل هذه المشكلة مهما تعقد وطال واحتاج إلى الصبر والمثابرة ليس إلا أن يصاغ هذا النظام التعليمي صوغا جديدا، ويلائم بعقائد الأمة المسلمة ومقومات حياتها وأهدافها وحاجاتها، ويخرج من جميع مواده روح المادية والتمرد على الله والثورة على القيم الخلقية والروحية، وتعبد الجسم والمادة، وينفخ فيه روح التقوى والإنابة إلى الله، وتقدير الآخرة، والعطف على الإنسانية كلها، فمن اللغة والآداب إلى الفلسفة، وعلم النفس، ومن العلوم العمرانية إلى علوم الاقتصاد والسياسة لا تسيطر على كل ذلك إلا روح واحدة، يقصي استيلاء الغرب العقلي ويكفر بإمامته وسياسته، وتجعل علومه ونظرياته موضوع الفحص والدراسة الجريئة، ويوضح ماذا جنى تفوذ الغرب وسيطرته على الإنسانية والمدنية، وتدرس علومه بشجاعة وحرية، وتعتبر كمواد خامة نصنع منه ما يوافق حاجاتنا ورغباتنا وعقيدتنا وثقافتنا.

إن هذا العمل ولو كانت في طريقه عقبات وعراقيل، ولو تأخرت نتائجه، ولكنه حل وحيد للموجة الطاغية التي قد اكتسحت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، موجة التجدد والتغرب التي تتحدى الكيان الفكري للإسلام وجهازه الاجتماعي، وظلت تهدد حياته وبقائه.

...هذا التغيير الجذري لنظام التعليم وتكوينه الإسلامي أمر لا غنى عنه، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى مواهب ومؤهلات عظيمة، وسائل كثيرة

[এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো, শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপায়ন। তা যতই সুকঠিন ও কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী হোক না কেন। যা মুসলিম জাতির মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, জীবনীশক্তি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনসমূহের উপযোগী হবে। সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, খোদাদ্রোহিতা, আত্মিক ও চারিত্রিক মুল্যবোধ বিরোধী আচরণ এবং প্রবৃত্তিপূজা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করবে।

খোদাভীতি, আল্লাহমুখিতা, আখিরাতকে প্রাধান্য দান, এবং সর্বোপরি মানবতাবোধের ঝোঁক-প্রবণতার মূলধারা ছড়িয়ে দিবে। ভাষা-সাহিত্য থেকে শুরু করে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, এবং বিজ্ঞান থেকে অর্থনীতি, রাজনীতি, তথা সর্বত্র একই আত্মাশক্তির বিচরণ থাকবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবকে মিটিয়ে তাদের নেতৃত্বকে অস্বীকার করবে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণা ও অধ্যয়নসাপেক্ষ বিবেচনা করবে। স্পষ্ট করে তুলে ধরবে, মানবতা ও সমাজের উপর পাশ্চাত্য কী কুপ্রভাব ও ক্ষতি করেছে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পূর্ণ সাহসিকতা ও স্বাধীনতার সাথে অধ্যয়ন করা হবে। তাদের গবেষণাকে অপরিপক্ক বিবেচনা করে আমাদের আকীদা, সংস্কৃতি ও প্রয়োজন মাফিক রূপায়ন করব।

এ কাজটির বাস্তবায়ন যত দুরুহ ও কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ হোক, এটিই একমাত্র সমাধান মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের নেতৃত্বদানকারী তাগুতি শক্তিকে রুখে দাঁড়ানোর। এই অপশক্তিটি ইসলামী চেতনা, মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে আসছে এমনকি ইসলামের জীবন-মরণের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

শিক্ষাব্যবস্থার এই মৌলিক পরিবর্তন ও ইসলামায়ন অতি আবশ্যক একটি বিষয়। যদিও তা দীর্ঘ সময়, প্রতিভাধারী যোগ্য ব্যক্তি ও উপায়- উপকরণসাপেক্ষ।][৬]

[৬] নাহওয়াত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা (نحو التربية الإسلامية): সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী পৃ. ৪১-৪৫, দ্র. আছছিরা' বাইনাল ফিকরাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ফিকরাতিল গারবিয়্যাহ পৃ.১৭৭-১৯১।